রুক্মি

বুদ্ধদেব বসু

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম খণ্ড

১

এই তো আমি, ধীরাজ দত্ত, বিয়াল্লিশ বছরের ভদ্রলোক, চাকুরে, ব'সে আছি চৌরাস্তায় বেঞ্চিতে, আমার পেছনে বরফে মোড়া পাহাড়— সারাক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমার সামনে কলকাতার লোকের ভিড়, চঞ্চল, সুখী,—অন্তত চোখে দেখতে সুখী ;—ঠিক আগেকার মতো, শুধু একটা বিষয়ে আলাদা—সেই দার্জিলিঙে, আবার, বারো বছর পরে। আমি আসতে চাইনি, কিন্তু দার্জিলিং দ্যাখেনি ব'লে কমলার ভারি আপশোশ, বিয়ের পর থেকে বলছিলো। 'বরং চলো দীঘাতে ঘুরে আসি, ময়ূরাক্ষীর টুরিস্ট-বাংলো শুনেছি চমৎকার—' এমনি ছুতোনাতা ক'রে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন, কিন্তু এ-বছর আমার বড়ো একটা লিফট হ'লো, তার ওপর পুজোর বোনাস তিন মাসের মাইনে, 'টাকা নেই' অজুহাতও অচল। আসতেই হ'লো। কিন্তু এসে অবধি…

যখন সমতল ছেড়ে উঁচুতে উঠছি তখন থেকেই··· ঠিক যে-ভয়ে আমি আসতে চাইনি···আমার শান্তি নেই, কত কী ভাবছি।

'এই, দ্যাখো···ঘোড়ায় চেপে টবলুকে কী গ্র্যাণ্ড দেখাচ্ছে! আর কী মিষ্টি ঘোড়াটা! ওঠো—তেনসিঙের পাহাড়ি ইস্কুল দেখে আসি চলো। তুমি কেন ছবি তোলো না?'

প্রথম প্লেনে চড়া, প্রথম হিমালয় দেখা, বুদ্‌বুদে আর ফেনায় টলমল করছে কমলা, যেন আমারই কোনো ভূতপূর্ব নারীচরিত্র। এককালে আমার নায়িকারা বেশ চটক ধরিয়েছিলো, এ-ক' বছরে তাদের জেল্লা ঝ'রে গেছে। তা যাক, আমার কী এসে যায়, আমি তো আর বইয়ের টাকার ওপর নির্ভর করছি না আজকাল। আপাতত আমার সুখ এটুকুই যে আমার জ্যান্ত নারীটির একটি সাধ পূরণ হ'লো। কিন্তু আমার পক্ষে···ডোজ় একটু বেশি হ'য়ে যায় মাঝে-মাঝে।

বাগডোগরা থেকে ট্যাক্সিতে আমার ঘণ্টাগুলি ভালো কাটেনি। চালকটি ছিলো বড্ড কথুরি, এক দোস্তকে পাশে তুলে নিয়ে নেপালি ভাষায় লম্বা এক 'কেচ্ছা' জুড়ে দিয়েছে, তাছাড়া টবলুর হাততালি চীৎকার, আর মিনিটে-মিনিটে উপচে-পড়া কমলা—'আহা কী সুন্দর সত্যি! টবলু, ফের উঠে দাঁড়িয়েছিস? চুপ ক'রে বোস! এই (আমার কাঁধে ঠেলা দিয়ে), দ্যাখো দ্যাখো!'—যেন গাড়ি-বোঝাই হট্টগোল নিয়ে চলেছি, এদিকে কর্কস্ক্রুর মতো রাস্তা, একপাশে বুড়ো-বুড়ো গাছে ভর্তি পাহাড় আরো উঁচু হচ্ছে, আর অন্য পাশে খাদ আরো পাতাল, সাংঘাতিক এক-একটা বাঁক নিতে গিয়েও ড্রাইভার-সাহেব কথা থামাচ্ছে না—আর আমি ব'সে আছি টান হ'য়ে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে, দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিহীন, প্রাণপক্ষী বিষয়ে শঙ্কিত। অসাধারণ স্নায়ুর জোর নেপালিটির, কিন্তু আমি আর এখন ভাবতে

পারি না যে বিশ্বধামে অন্য যেখানে যা-ই হোক, আমি আছি জিৎ-পার্টিতে।

কার্সিয়ঙের কাছাকাছি এসে কমলা বললো, 'শীত করছে। আমার স্কার্ফটা কোথায়?' স্কার্ফ পাশেই ছিলো, আমি তার কাঁধে পিঠে জড়িয়ে দিলাম, দৈবাৎ তার একটি স্তন আমার হাতে ঠেকে গেলো। সে ফিরে তাকিয়ে ঝকঝকে ভেজা দাঁত দেখিয়ে হাসলো, আমার হাতে চাপ দিলো একটু, আমার মনে পড়লো প্লেন থেকে নামার আগে সে আর-এক দফা প্রসাধন সেরে নিতে ভোলেনি। আমি গাড়ির কোণে হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম, আমার ক্লান্ত লাগছিলো, পকেট থেকে একটা অ্যাস্পিরিন বড়ি বের ক'রে চিবিয়ে খেয়ে নিলাম আলগোছে। জিভের ওপর তেতো স্বাদটা ভালো লাগলো আমার। একটু ঝিমুনি এসেছিলো হয়তো, চোখ মেলে দেখি দার্জিলিং এসে গেছে। ডাইনে একটা শাদা বাড়িকে মনে হ'লো হিমানী হোটেল—ঠিক বুঝলাম না। হলুদ-রঙা ঠাণ্ডা রোদের মধ্যে খাড়াই পথে হেঁটে-হেঁটে উঠলাম এসে উইণ্ডামিয়ার হোটেলে। এটাও কমলার শখ—শুনেছে ওখানে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র শুটিং হয়েছিলো। কেমন সব ছায়া নিয়ে সুখী হয় মানুষ।···তা সুখী হওয়া দিয়েই কথা।

আমরা এসেছি মাত্র পর্শু, কিন্তু দু-দিনেই বাঁধা ছকে প'ড়ে গিয়েছি। সারা সকাল ঘুরে বেড়ানো, বিকেলে ফের ঘুরে বেড়ানো, খাওয়া চারবার, রাস্তায় আধো-চেনা বা সদ্য-চেনা কারো সঙ্গে ঠুনকো কিছু আলাপ—আর মাঝে-মাঝে চৌরাস্তায় ব'সে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দেখা, যদি বা কোনো চেনা মুখ বেরিয়ে পড়ে···ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে দেখা, পাছে কোনো পুরোনো দিনের চেনা মুখ বেরিয়ে পড়ে। দার্জিলিঙের সবচেয়ে বড়ো সুবিধে এই যে এখানে এলে অন্য সবাই যা করে তা-ই

করতে হয়, কোনো বিকল্প নেই। আর অসুবিধে—ঐ পাহাড়গুলো, এত কাছে, এত দূরে, এত বড়ো, এত নিঃশব্দ, একই সঙ্গে এমন উদাসীন ও উপস্থিত। আমার মনে হচ্ছে দু-দিনেই অনেকদিন হ'য়ে গেলো।

সন্ধের পরে জীবন থেমে যায় এখানে। আমরা বসি আমাদের ঘরের সামনে কাচে-ঢাকা বারান্দাটিতে, মা-ছেলের জন্য কোকা-কোলা আসে, আর আমি আস্তে-আস্তে দুটি পেগ ব্ল্যাক নাইট নামিয়ে দিই। ঠিক দুটি, তার বেশি এক ফোঁটাও না—আমারই এক পুরোনো আমলের বন্ধুর অবস্থা দেখে সাবধান হ'য়ে গিয়েছি। আমি ভালো আছি আজকাল, ওজন বেড়েছে, সকালবেলা মাথা-ধরা নিয়ে জেগে উঠি না, যাদবপুরের বাড়িটা দাদাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে এসেছি সর্দার শঙ্কর রোডে, আমার স্ত্রী ঘরকন্নাতে পটু, ফ্ল্যাটটাকে বেশ গুছিয়ে রাখে, আমার ছেলেকে চড়া-দামের ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে দিয়েছি—আমার চারদিকে সব ঠিক আছে।... কিন্তু সন্ধের পরে দার্জিলিঙের এই স্তব্ধতা, ভারি বিরাট পাহাড়গুলোর এই স্তব্ধতা, যেন অগুনতি ছুঁচ ঝিঁ-ঝিঁ, কান পেতে শুনলে দম আটকে আসে। কলকাতায় সন্ধে শুরু হয় দেরিতে, কলকাতায় সন্ধে আসে সুখের আশায় প্রয়োজনের চাপে ভরপুর, আড্ডা সিনেমা শাড়িতে নিলেমে জ্বলজ্বলে—বাড়ি থেকে না-বেরিয়েও ভিড়ের মধ্যে থাকা যায়। কিন্তু এখানে—নিছক আমরা: স্বামী, স্ত্রী, সন্তান—সমাজের ভিত্তি, সংসারের আদি সত্য, আর জগৎ জুড়ে ঝাঁ-ঝাঁ স্তব্ধতা, আর আমরা পরস্পরের হাতে উপকারীভাবে বন্দী।

কথাবার্তার চেষ্টা করি আমরা। আমি টবলুকে মৌখিক যোগ মকশো করাই, কমলা আত্মীয়স্বজনের কথা তোলে; আমি টবলুকে ভূগোলের গল্প বলি, দু-একটা পারিবারিক ঠাট্টা পুনরুচ্চারিত হয়। বিশু-মামা ফ্ল্যাট কিনেছেন সি. আই. টি. রোডে, ফিরে গিয়ে যেতে হবে একদিন,

অনেকবার বলেছেন উনি—শোনামাত্র আমি ব'লে উঠি, 'সীরিয়াসলি, একদিন যেতে হবে', সঙ্গে-সঙ্গে কমলা হেসে ওঠে খিলখিল ক'রে, টবলুও লাজুকভাবে হাসে—সেও জানে তার বিশু-দাদুর কথায়-কথায় 'সীরিয়াসলি' বলার অভ্যেসটা এক মজার ব্যাপার।

বা টবলুকে ছবি আঁকতে বসিয়ে কমলা আর আমি একটি পুরোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করি কিছুক্ষণ। কেন সুপর্ণা আসানসোল কলেজে চাকরি নিয়ে চ'লে গেলো, আর বীরেন প'ড়ে রইলো একা কলকাতায়—শুধু শনি-রোববারে দেখা, তাও প্রতি সপ্তাহে নয়, এ-রকমভাবে দিন কাটালে আর বিয়ের কী অর্থ রইলো, টাকাটা কি এতই বড়ো জীবনে, না কি ওদের মধ্যে কিছু গোলমাল··· 'কী জানি বাপু, এ-সব ফ্যাশান আমি বুঝি না।' মুখ টিপে হাসে কমলা, তার গাল বেয়ে চুঁইয়ে পড়ে তৃপ্তি—সে নিজে বিয়ের আগেই তার স্কুলমাষ্টারি ছেড়ে দিয়েছিলো—তার নিজের ইচ্ছায়, আমারও গরজে—আমি বলেছিলুম মেয়েদের পক্ষে বিয়েটাই হোল-টাইম চাকরি তার ওপর আর কেন? কথাটা খুব মনে ধরেছিলো তার, আমাকেও মনে ধরেছিলো, দশ বছর পরেও সে জানে তার বিয়েটা একটা মস্ত 'সাক্সেস', জানে আমি তারই জন্য বদলে গিয়েছি, 'ভালো' হয়েছি। সুখে আছে কমলা, উপার্জনশীল স্বামী ও সুচিন্তিতভাবে উৎপন্ন একটিমাত্র সন্তান নিয়ে সুখে আছে—মাঝে-মাঝে শুধু এই ব'লে দুঃখু করে যে তার স্বামী এখন আর নামজাদা একজন লেখক নয়।

এমনি ক'রে আমরা সন্ধেবেলাটাকে সাঁৎরে পার হই, ডিনার এগিয়ে আসে, রাত ভারি হয়।

কিন্তু ভারি হ'লেই রাত্রি ক্রমশ হালকা হ'তে থাকে। অমন নিথর

আর মনে হয় না তখন, আসলে সেটা স'য়ে গেছে ততক্ষণে। খাওয়ার পরে টবলু তার নিজের বিছানায় ধপাশ, কমলাও বেশি দেরি করে না, কম্বলের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'তুমি এসো, শোবে না?' তার কাঁধের ওপর নীলচে-কালো তিলটা আমার চোখে পড়ে, তার আংটির লাল পাথরটা ঝিলিক দেয়। 'এই আসছি—' ব'লে আমি সিগারেট ধরাই, ভোজনপরবর্তী হজমি রসের ক্ষরণ কমলাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় আস্তে-আস্তে, আমি টেবিল-ল্যাম্প জ্বালি, ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে মোজা পায়ে পায়চারি করি ঘরের মধ্যে, সাড়ে-দশটা বাজে, এগারো···আমি একটা খাতা কিনে এনেছি আজ সকালে, বহুকাল পরে আমার মনে হচ্ছে কিছু লিখলে হয়। ঠাণ্ডা বাড়ে, কম্বলের তলায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে কমলা, আমি তার কালো খোঁপাটা দেখতে পাচ্ছি শুধু, দেখতে পাচ্ছি জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে এক আবছায়া, হিম কাচে প্রায় নাক ঠেকিয়ে—প্রথমে চোখ গাছের ভিড়ে আটকে যায়, কিন্তু তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দুধের মতো শাদা মনে হয় রাত্রিকে, এত পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষার ঐ উত্তরদিকে—ধবলগিরি, কনকশৃঙ্গ, সুমেরু—আর ওপরে, তাদেরও ওপরে, লক্ষ চোখে বিভাবরী তাকিয়ে আছেন। ও-সব দেখলে কার আর কলম হাতে নেবার সাহস হবে, কে না চাইবে ছুটি খারিজ ক'রে কলকাতায় আপিশে ফিরে যেতে, কে না চাইবে দেয়াল, অবরোধ, বাধ্যতা? কেন লেখা, কেন ভাবা, কেন হঠাৎ কিছু বলার মারাত্মক ইচ্ছে? কিছু বলা, অন্য কিছু, অন্য কারো কাছে, যে এখানে নেই? আলোর তলায় খাতাটা আমি খুলে ধরি, শাদা কাগজের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ত্রস্ত হাতে বন্ধ করি আবার, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি। না—অসম্ভব, ঐ একটা কথা থাক শুধু আমার।

বিছানায় আমার দিকটা হিম, কিন্তু ঐ তো কমলা, হাঁটু মুড়ে কুঁকড়ে

শুয়ে আছে, আমি তার পায়ে পা ঘ'ষে শীত ভাঙাই, সে বেড়ালের মতো নরম আওয়াজে সাড়া দেয়···আর-একটা মানুষ, ঘুমের মধ্যেও শরীরের সব ওম নিয়ে জীবন্ত, আর-একটা মানুষ, যে আমি নই। নিজের কাছ থেকে পালানো—মানুষের আসল কাজ হ'লো তা-ই। অন্তত কোনো-কোনো মানুষের।

২

কিন্তু রুক্মির সঙ্গে দেখা হবার আগে আমার কখনো মনে হয়নি সে-কথা। এইজন্যে মনে হয়নি যে নিজের সঙ্গে একা হবার সময় আমার ছিলো না তখন। নানা ধরনের বন্ধু—লেখক, বা লেখক হ'তে চায়, বা হ'তেও চায় না কিন্তু ঐ মহলে মিশতে পারাটাকে ভাগ্য ব'লে ভাবে, আমার নাম ছড়াচ্ছে, লেখার ফরমাশ হালফিল পাচ্ছি, বাড়িতে মা আর বৌদির যত্ন, আর বাইরে নিত্যি-বেড়ে-চলা ভক্তের দল···যখন আমি শারীরিকভাবে একা তখনও তারা ঘিরে আছে আমাকে। আমি দরাজ হাতে বিলিয়ে দিচ্ছি নিজেকে, কলকাতায় ও মফস্বলে সাহিত্যসভায় যাচ্ছি, ছবি বেরোচ্ছে কাগজে-পত্রে, আমি হ'য়ে উঠছি একেবারে বেপর্দা, বেওয়ারিশ। ধরা যাক এই দার্জিলিঙেই সেবার—আমাকে কেউ-কেউ চিনে ফেলতো চৌরাস্তায়, বিশেষত অল্পবয়সী মেয়েরা। চলতে-চলতে

হঠাৎ থেমে গেছে তারা, লম্বা নিশ্বাস টেনে বলেছে, 'একটা কথা জিগেস করতে পারি? আপনি কি সাহিত্যিক…?' এ-ধরনের সম্ভাষণে অভ্যস্ত আমি, অভ্যস্ত হাসি ফুটিয়েছি ঠোঁটের কোণে, অভ্যস্ত রসিক চোখে তাকিয়েছি। আর তারপর—ভোমরা চোখ, বাঁকা ভুরু, লাজুক চপল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে-যাওয়া জোড়াতালি-দেয়া সংলাপ, যেন অঢেল সূর্যের ওপরেও আর-এক পল্লা রোদ্দুরের তাপ, যা দার্জিলিঙের মেঘলা দিনেও উষ্ণ রাখতে পারে আমাকে—আমি উপভোগ করেছি, আমার অবস্থায় কে না করতো?

আমি নাকি উপন্যাস লেখায় একটা ফর্মুলা তৈরি ক'রে নিয়েছি—এ-রকম কথা বলেছে তখন কেউ-কেউ। আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের একঝাঁক ছেলেমেয়ে, দু-একটা রগরগে প্রেম, উঁকিঝুঁকি রাজনীতির ছায়া, মাঝে-মাঝে গোয়েন্দা ধরনের রহস্য—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো পরিণামে পৌঁছয় না কেউ, শেষ পর্যন্ত কিছুই নাকি 'হয় না'। তা, হবে হয়তো তা-ই, কিন্তু বছরে তিনটে ক'রে এডিশন যা-হোক হ'য়ে যাচ্ছে তো। একবার এমন কথাও শুনেছিলাম আমি 'জনপ্রিয়' হবার জন্য 'উঠে-প'ড়ে লেগেছি'—শুনে অবাক হয়েছিলাম, কেউ পারে নাকি চেষ্টা ক'রে জনপ্রিয় হ'তে, তাহ'লে সবাই কেন হয় না? আর তাছাড়া আমি যে অমন হিট্‌ হ'য়ে যাবো তা কি আমিই কল্পনা করেছিলাম কখনো? কাঁপা-কাঁপা হাতে প্রথম উপন্যাসটি লিখেছিলাম কোনো-এক পূজা-সংখ্যা থেকে থোকে তিনশো টাকা পাবার জন্য (তা-ই আমার কাছে অনেক টাকা তখন), আর তারপর থেকে…থামিনি, থামতে দেয়া হয়নি আমাকে…পাঁচ বছরে চব্বিশখানা বই…যাদের দেখেছি তাদেরই কথা লিখেছি, সরল সহজ আলাভোলা আমার লেখার ধরন, আমি মানুষটাও সরল সহজ আলাভোলা, জ্ঞানের কথা বলি না, গভীর জলের মাছ ধরতে

গিয়ে ক্লান্ত করি না পাঠকদের বা নিজেকে, 'এই-এই ঘটেছিলো, মশাই, আর-কিছু জানি না আমি—' এমনি বোধহয় ধরনটা আমার, আর যদি সেটা লোকের মনে ধ'রে গিয়ে থাকে তো আমি কী করতে পারি?

এখনো, সে-সব দিনের দিকে ফিরে তাকালে, আমি লজ্জা পাবার কোনো কারণ দেখি না। মানে, আমি তখন যে-মানুষ ছিলাম তার পক্ষে সেই জীবনই ঠিক ছিলো। চিন্তাহীন, এলোমেলো, হালকাভাবে ব'য়ে-যাওয়া—আমার লেখারই মতো। যে-সব ভেতরকার তাড়নায় মানুষ জটিল আর অসুখী আর খাপছাড়া-মতো হ'য়ে ওঠে, তার কোনোটাই ছিলো না আমার। ছিলো না উচ্চাশা, নিজেকে আর পাঁচজনের চাইতে আলাদা ব'লেও ভাবিনি কখনো। ছিলো না ভালোবাসাবাসির জ্বলুনি-পুড়ুনি, আমার বন্ধুতাগুলিও ছিলো যখনকার-তখন, ঈর্ষা থেকে মুক্ত ছিলাম তাই। সাধারণভাবে বি. এ. পাশ ক'রে বেরোবার পর আমার সামনে কিছু নেই দেখে ছটফট করিনি, ধ'রে নিয়েছিলাম কিছু থাকবে না। বাবা একটি ছোটো বাড়ি রেখে গিয়েছেন যাদবপুরে, দাদা আছেন, মা ভালোটা-মন্দটা রেঁধে খাওয়ান, বছরে তিনবার ধুতি-টুতি দেন বৌদি, শীতকালে সোয়েটার বুনে দেন, আর আমি কখনো স্কুল-মাষ্টারি আর কখনো কোনো অখ্যাত কাগজে সব-এডিটরি ক'রে যা পাই তাতে আমার সিগারেট পথ-খরচা টেরিলিন শার্ট চ'লে যায়—আর কী চাই? আর এরই মাত্র কয়েক বছর পরে, যখন ফিল্মওলাদের নজর পড়েছে আমার ওপর, প্রকাশকেরা জোর ক'রে আগাম টাকা দিয়ে যাচ্ছে, এদিকে আমার লেখার ব্যাখ্যা ক'রে এক প্রোফেসর প্রবন্ধ লিখেও ফেলেছেন (আমি যার কিছুই বুঝিনি, শুধু দু-একটা বিদেশী নাম শিখেছিলাম)—তখনও আমি তেমনি খোলামেলা, লেখার কয়েক ঘণ্টা বাদ দিয়ে বাইরে-বাইরেই দিন কাটাই। আর লেখাটাও তেমন খাটুনির

ব্যাপার নয় আমার কাছে, বসলেই ঝরঝর ক'রে বেরিয়ে আসে, খুব বেশিক্ষণ আটকে থাকতে হয় না। আর বাইরে, এসপ্লানেড থেকে শ্যামবাজার পাঁচ রাস্তার মোড় পর্যন্ত সাহিত্যিক দল, বোতল-বন্ধুরা, আরো কত কী। জীবনের ওপর দিয়ে ভেসে-ভেসে চলেছি যেন, ডুবছিও না, কোথাও পৌঁছবারও তাগিদ নেই। এইজন্যে, যারই সঙ্গে নতুন চেনা হচ্ছে সেই পছন্দ করছে আমাকে, কাউকে বোকা ব'লে বুঝলেও তাকে আড্ডায় টানতে আপত্তি নেই আমার, আমার সমবয়সী বা কম-বয়সী যারাই লিখছে তাদেরই বলি 'বাঃ, চমৎকার!' কিন্তু যাকে বলে সাহিত্য নিয়ে 'আলোচনা' তা কখনোই করি না—আমার আসে না ও-সব, লোকেরাও বিরক্ত হয়।

বাড়ির সঙ্গেও আমার সম্পর্ক বেশ ভালো। দাদার রোজগার মাঝারিগোছের উঁচুর দিকে, কিন্তু খরচা বিষয়ে উদমো স্বভাব নয় তাঁর, এদিকে বৌদির শখ বাড়িটাকে টুকটাক বাড়ানো বদলানো (আমি ভেবেই পাই না কী দরকার ও-সবের, আমার মনে হয় বয়স্ক মহিলার পুতুল-খেলা ওটা)—তা যা-ই হোক বরাদ্দ মাপে সংসার চলতো আমাদের, কিন্তু আমি সেখানে হঠাৎ একটা সচ্ছলতার হাওয়া এনেছি—যখন-তখন বৌদির হাতে টাকা দিয়ে বলি, 'মুর্গি আনবে? গঙ্গার ইলিশ?'—মাঝে-মাঝে নিজের হাতেও নিয়ে আসি নিউ মার্কেট থেকে সসেজ স্যালামি ওলন্দাজি পনির, ভাইপো-ভাইঝির জন্যে বাক্স-ভর্তি পেস্তা-বাদাম-মেশানো আইসক্রীম, কখনো হয়তো ফার্পোর কেক, ক্রীম-রোল—এ-সবের আগে চল ছিলো না আমাদের বাড়িতে, আমিও নতুন স্বাদ পাচ্ছি। একদিন পার্ক স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, শো-কেসে একটা ফ্রিজ দেখে হঠাৎ খুব মনে ধ'রে গেলো; তিনদিন পরে ঠেলা থেকে ঐ নতুন সামগ্রী নামতে দেখে বৌদি অবাক—আর খুশি। কিন্তু খাবার ঘরের

জন্য পাখা আনালাম যেদিন, দাদা বললেন, 'এইটুকু ঘর, অত বড়ো পাখা দিয়ে কী হবে, টেবল-ফ্যানেই তো চ'লে যাচ্ছিলো বেশ।' ট্র্যানজ়িস্টর নিয়েও সেই কথা—'কী দরকার ছিলো, একটা রেডিও আছে তো। তুই বড়ো আবোলতাবোল খরচ করিস।' বৌদি আমার পক্ষ নিয়ে বললেন, 'আহা—শখ ক'রে এনেছে, আর ট্র্যানজ়িস্টরে সুবিধে কত!' আমি সাফাই গাইলাম, 'এক বন্ধুর দোকান থেকে এনেছি, অর্ধেক দাম নিলো।' পুরো সত্য নয় কথাটা, কিন্তু দাদাকে আমি কী ক'রে বোঝাই আমার খরচ করতেই ভালো লাগে, আমার পকেট থেকে যে টাকাগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে—এবং আবার আসছে—এই ঘটনাটাই বেশ উপভোগ্য ব'লে মনে হচ্ছে আমার। ঐ একটা ব্যাপারে দাদার সঙ্গে আমার গরমিল, অন্য দু-একটা ব্যাপারেও, কিন্তু আমি কখনো তাঁর মুখের ওপর কথা বলি না। একটা সময় গেছে, যখন দাদা আমাকে বলতেন ফিক্সড ডিপোজ়িটে টাকা জমাতে, ইনশুরেন্সের পলিসি নিতে, ইনশুরেন্সের সুবিধেগুলো বুঝিয়ে দিতেন আমাকে—কত সুদ, কত বোনাস, হঠাৎ কোনো ঠেকায় পড়লে কেমন বিনিসুদে ধার পাওয়া যায়, ইত্যাদি—আমি ধৈর্য ধ'রে শুনে গিয়েছি, অন্তত শোনার মতো ভাব করেছি মুখের, হুঁ-হাঁর বেশি জবাব দিইনি, দিন কেটে গেছে. তারপর একদিন স্থায়ীভাবে চাপা প'ড়ে গেছে কথাটা। এমনি হয়—আমি অনেকবার দেখেছি—কোনো-একটা বিষয় আমরা বেশিদিন ধ'রে মনে রাখতে পারি না, দাদা যা বলার বলুন আমি সেটা না-করলেই চুকে গেলো, তাছাড়া দাদার সঙ্গে আমার দেখাশোনাই বা কতটুকু। বেচারি দাদা, টাকাটা বড্ড বড়ো জিনিশ তাঁর কাছে, অল্প বয়সেই অনেক টাকার বীমা ক'রে ফেলেছেন, কিস্তি চালাতে প্রাণান্ত হয় মাঝে-মাঝে—কী-লাভ কে জানে, এখন কষ্ট ক'রে বুড়ো বয়সে গুচ্ছের টাকা

হাতে পেয়ে কোন স্বর্গলাভ হবে তাঁর—আর ততদিনে টাকার দামও কি হুদ্দাড় নেমে যাবে না? হয়েছিলো কী, বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর তাঁরই ঘাড়ে সংসার পড়েছিলো—আমি তখনও ইস্কুল পেরোইনি—বি. কম. পাশ ক'রে···ব্যাঙ্কের পরীক্ষা পাশ ক'রে···এই দু-বছর আগে একটা ছোটো ব্রাঞ্চের এজেন্ট হয়েছেন—সেটা তাঁর পক্ষে একটা বড়ো জিনিশ, কিন্তু কেমন ক'রে ঐ খুপরি ঘরটায় সারাটা দিন কাটিয়ে দেন, যোগ-বিয়োগের জঙ্গলের মধ্যে সারাটা দিন, আমি সত্যি ভেবে পাই না। আমি বুঝি, দাদা মনে-মনে বেশ একটু গর্বিত তাঁর ভাই একজন নামজাদা লেখক ব'লে, আমার বইগুলো তাঁর ঘরে দেয়াল-আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছেন, কাউকে ধার দেন না—কিন্তু তবু, তিনি কি টের পান না আমি কখন বাড়ি ফিরি, কী অবস্থায় ফিরি, বা ফিরি কিনা রাত্তিরে···কিছু সন্দেহ করেন না?

আমি লুকোচুরি ভালবাসি না, ঐ মদের ব্যাপারটা বাড়িতে জানাজানি হওয়ায় নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। জানাজানি হ'তেই হ'তো, আমি মনে-মনে তৈরিও ছিলাম সেজন্য। আমাদের পুরোনো ঝি মানদাকে বলা ছিলো আমার, দরজার কাছেই মাদুর পেতে শুয়ে থাকে সে, তিনবার টোকা শুনলেই উঠে খুলে দেয়—ঘুম তার পাৎলা আর স্বভাবটি বড়ো ভালো, স্বামী তাকে ছেড়ে যাবার পর নিজের রোজগারে মানুষ করছে ছেলেকে, স্কুলে পড়াচ্ছে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে কতই বা মাইনে পায় সে, আমি তাকে যখন-তখন দু-পাঁচ টাকা দিয়ে থাকি। তা মানদা যতই সতর্ক আর আমার ওপর প্রসন্ন হোক, মদের কাজ মদ ক'রে যায়, কোনো-এক সকালে হয়তো দেখা গেলো আমার কপালের একটা দিক টিবির মতো ফুলে উঠেছে, মাঝে-মাঝে বেলা দশটা অবধি আমাকে ঘুমোতে দেখে মা বৌদি উদ্বিগ্ন হন। এক গভীর রাত্রে বমির

শব্দ পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে এলেন মা, আমার অসুখ করেছে ভেবে দাদাকে ডেকে আনলেন ওপর থেকে—সে এক কাণ্ড!—দাদা আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই তাঁর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন, মা-র ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে শুধু বললেন, 'ডাক্তার লাগবে না।' আর পরের দিন—মা-র চোখে জল, বৌদির মুখ থমথমে, তাঁরা মন-খারাপ ক'রে আছেন দেখে আমারও মনে কষ্ট হ'লো, স্নান ক'রে বেরিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ালাম তাঁদের কাছে, কিছু রসিকতা, গালগল্প, আদর-আবদার—'খিদে পেয়েছে, বৌদি—লুচি খেতে চাই, আর তোমার সেই বিখ্যাত পোস্তর তরকারি—' 'মা, ভাবছি একবার মাসিমার কাছে জামসেদপুরে বেড়িয়ে আসবো। তুমি যাবে?—' একটু-একটু ক'রে হাসি ফুটলো ওঁদের মুখে, আমি সে-দিনটা আর বাড়ি থেকে বেরোলাম না, কিছু লিখলাম, কিছু ঘুমোলাম, আর সন্ধেবেলা দাদা যখন ফিরলেন আমিই দরজা খুলে দিলাম তাঁকে, তিনি অবাক হলেন একটু, আমাকে এ-সময়ে বাড়িতে দেখতে আশা করেননি। এক ফাঁকে, মা-বৌদি যখন কাছাকাছি নেই, আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'খোকা, আমি আর তোকে কী বলবো, বুঝে-সুঝে চলিস।' আমি হালকা গলায় জবাব দিলাম, 'কিছু ভেবো না, দাদা, আমি ঠিক আছি। অনেকদিন দাবা খেলা হয় না, আজ বসবে একবার?'

আমার এই হালকা সুর, হাসিখুশি মেজাজ, 'ওতে-কী-আছে-ভাবছো-কেন' ভঙ্গি, সেটাই—যদিও অনেকবার অশান্তি হয়েছে সে-সময়ে—সেটাই জিতে গেলো শেষ পর্যন্ত। মা আমাকে অনেক অন্যায় কথাও বলেননি তা নয়, আমি প্রতিবাদ করিনি—কেননা প্রতিবাদ মানেই তর্ক, আর তর্ক আমার জঘন্য লাগে। দাদা একবার বলেছিলেন, 'তুই না-হয় আলাদা বাড়িতে থাক, সেখানে যা ইচ্ছে হয় করবি, আমরা দেখতে

আসবো না।' আমি জবাব দিলাম, 'এটা তুমি রাগের কথা বললে, দাদা, সত্যি কি তুমি চাও আমি চ'লে যাই?' তক্ষুনি দাদার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভারি গলায় বললেন, 'কেন বলি বুঝিস তো।' 'ও-সব যা-ই হোক, নিজের বাড়ি ছেড়ে থাকা যায় নাকি, আর এ-রকম রাজার হালে আর কোথায় থাকবো বলো তো?'— এগুলো আমার মনের কথা, বানানো নয়, ছেলেবেলা থেকে এই বাড়িতে অভ্যেস হ'য়ে গেছে আমার; দিনের মধ্যে যতই না অল্প সময় কাটাই এখানে, 'বাড়ি' বলতে এটাকেই বুঝি এখনো, একা-একা অন্য কোথাও গিয়ে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে সংসার পাততে হবে, তা ভাবতেই আমার গায়ে জ্বর আসে। আর তাছাড়া, বাড়ির সকলকেই আমি ভালোবাসি, ওঁদের কারো মনে দুঃখ দিতে আমি চাই না, কিন্তু তাই ব'লে ওঁদের প্রতিটি কথা মেনে চলবো তা কী ক'রে সম্ভব হয়, আর ওঁরা তা আশাই বা করবেন কেন? আমার বয়স তিরিশ হ'তে চললো, আমি যে নেহাৎ অপদার্থ নই সেটাও বোঝা গিয়েছে এতদিনে, আর সত্যি তো কোনো খারাপ কাজও করছি না আমি। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য আমি ফাঁকে-ফাঁকে মদের কথা তুলি ওঁদের সামনে, খুব আলগোছে, যখন সকলেরই মন-মেজাজ ভালো আছে এমন একটা সময় বেছে নিয়ে— আমাদের বাড়িতে না-হয় চল ছিলো না কোনোদিন, কিন্তু কলকাতায় মদ আজকাল জল-ভাত হ'য়ে গিয়েছে, শুধু ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে নয়—এই ধরো অমুকবাবু, তমুকবাবু (এমন কয়েকটা নাম যা সকলেই চেনে), আসলে তেমন ভীষণ কিছুও নয় ওটা—তোমরাই বলো, আমার কি কোনো ক্ষতি হচ্ছে, বই-টই লিখছি তো, একটা কাজ নিয়ে আছি যা-ই হোক, এ নিয়ে তোমরা আর দুশ্চিন্তা কোরো না।—হয় আমার এ-সব কথায় ট'লে গিয়ে, নয় চেষ্টা ক'রে-ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে, ওঁরা একে-একে

সবাই চুপ ক'রে গেলেন, আমি রাত্রে বাড়ি ফিরলেই ওঁরা খুশি, না-ফিরলেও 'কোথায় ছিলি?' জিগেস করেন না, আমিও চেষ্টা করি যাতে বেশামাল অবস্থায় ওঁদের সামনে পড়তে না হয়। আমার নতুন-নতুন লেখাগুলি আমার সহায় হচ্ছে, আমি এই রকমই, এটা ওঁরা মেনে নিয়েছেন। সমস্যা মিটে গেলো।

শুধু একটা কথা মা এখনো তোলেন মাঝে-মাঝে—খুবই মামুলি, কিন্তু মা-র কাছে প্রকাণ্ড এক ব্যাপার, তা না-হ'লে যেন জীবনটাই বৃথা হ'য়ে গেলো। 'তুই বিয়ে করবি না?' হেসে বলি, 'তুমি পাগল হয়েছো, মা, এখনই বিয়ে করবো কী।' 'তার মানে? তুই কচি খোকা আছিস নাকি এখনো?' 'তাহ'লে দাও একটি মনের মতো জুটিয়ে।' 'কেন, তোমার ভক্ত পাঠিকাদের মধ্যে মনের মতো কাউকে খুঁজে পাওনি?' বৌদির এই- কথার উত্তরে আমি বলি, 'তারা সব রসগোল্লা-মার্কা।' (এমনি আমার ভাষা ছিলো তখন।) 'প্রেম-ট্রেম করো না কারো সঙ্গে?' 'রক্ষে করো, বৌদি—প্রেম!' 'তাহ'লে তোমার জারিজুরি সব বইয়ের পাতায়?' 'ঠিক তাও নয়।'

বৌদি হয়তো ভাবলেন আমি কোনো রহস্যময় প্রেমের ব্যাপার লুকিয়ে রাখছি, কিন্তু আসল কথাটা উল্টো। আমি দেখেছি বাঙালি মেয়েরা বাইরে যতই পেখম ছড়াক, মনে-মনে এখনো তারা পর্দানশিন। যারা কিছুটা খোলশমুক্ত তাদের বয়স বেশি, দু-এক খেপ বাচ্চা হ'য়ে গেছে। কিন্তু ছিপছিপে কুমারী মেয়েদের সঙ্গে অল্প খানিকটা এগোতে হ'লেও বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। আমার অত ধৈর্য নেই, সময়ও নেই। তাই, যদিও দেখেছি অনেক, মিশেছি অনেক, খুশেছি অনেক, কোনো সুমিতা বা অলকা বা অনুরাধাকে 'জুৎসই' ব'লেও মনে হয়েছে মাঝে-মাঝে, চুমু-টুমুও খেয়েছি, তবু কারো সঙ্গেই রোমান্স পাকিয়ে

তুলতে পারিনি—বা ইচ্ছে ক'রেই তুলিনি, অন্য দিক থেকে সে-রকম কোনো লক্ষণ দেখলেই কেটে পড়েছি। দেখেছি তো এক-একজন 'প্রেমে-পড়া' বন্ধুকে—যেন দাসখৎ লিখে দিয়েছে এমনি অবস্থা। দাঁড়িয়ে থাকো আপিশ কি কলেজের সামনে, বাড়িতে গিয়ে পিসিমার সঙ্গে ভাব জমাও, আজ সর্দি, কাল বিয়ের নিমন্ত্রণ, নিয়ে যাও রেস্তোরাঁয় সিনেমায় গঙ্গার ধারে (যেন আমারই কাহিনী 'অবলম্বনে' রচিত কোনো ফিল্মের দৃশ্য, যা দেখতে-দেখতে আমার চোখের পাতা পিটপিট করে)—এদিকে ন-টা বাজলেই যাই-যাই রব মা ভাববেন—মোদ্দা কথা, সুখ যদি দশ ভাগ তো হয়রানির ভাগ নব্বুই, কিংবা সবই যেন 'দুটি হাত এক' ক'রে দেবার রিহার্সেল শুধু—অথচ ভবসংসারে এত রকম বিষয় থাকতে হঠাৎ কেন ঐ একটা মেয়ের সঙ্গেই লেপটে যেতে হবে, তারও কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশেও মুক্ত নারী আছে কিছু-কিছু, আমারই মতো সোজা রাস্তায় চলতে চায় তারা, ধানাইপানাই পছন্দ করে না। সকলে খোঁজ রাখে না তাদের, কিন্তু যেহেতু আমার আড্ডার ঘাঁটি অনেকগুলো, সিনেমা-মহলেও ঘোরাঘুরি আছে, তাই আমি মাঝে-মাঝেই দেখা পেয়ে যাই তাদের, দেখামাত্রই চিনতে পারি, বোঝাপড়া হ'তে দেরি হয় না। ভালো জমে আমার তাদের সঙ্গে, তারাও ভীরু পাখি নয়, আমিও নই পিঞ্জর—কেউ বা শুধু সুখের জন্যই সুখের পিয়াসী, কেউ কোনো উচ্চাশার সোপান হিশেবে আমাকে ব্যবহার করছে (তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই), কেউ বা কোনো ছুতো ক'রে কিছু টাকা 'ধার' নেয়, আমি হেসে বলি ও আর তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে না। আমি উপোশ ক'রে নেই, আমার পক্ষে বিয়ে ব্যাপারটা বেদরকারি।

—এমনি ছিলাম আমি, সুখী, স্বাধীন, নিশ্চিন্ত—নিজের বা

জগতের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নেই, নিজের বা জীবনের কাছে বিশেষ কোনো দাবি-দাওয়া নেই, সামনে-পেছনে না-তাকিয়ে শুধু মুহূর্তগুলোকে নিয়ে খেলা করছি—সেই যখন বারো বছর আগে দার্জিলিঙে এসেছিলাম।

৩

এবার অবশ্য চৌরাস্তায় আমি একলা। যদি না স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গী ব'লে ভাবা যায়, বা রোদ আর আকাশ আর তুষারশৃঙ্গকে। কেউ ফিরে তাকায় না আমার দিকে, কেউ এগিয়ে আসে না। আমার সেই চাঞ্চল্যকর খ্যাতি—কবে যে তা ফুটো পকেট থেকে আধুলির মতো প'ড়ে গেলো, মনে হয় যেন টেরও পাইনি, কষ্ট পাওয়া দূরে থাক। কোনো-এক সময়ে এটাই আমি চেয়েছিলাম—এই অনামিত্ব, এই অন্য কারো চোখে-না-পড়া দৈনন্দিন। আমার মনের সঙ্গে তাল রেখে আমার শরীরটাও বদলে গেছে, আমি তাতে সাহায্য করেছি। তখন ছিলো কান-ছাপানো চুল, কিন্তু একটা বনেদি ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানে ও-সব মানায় না, তাছাড়া আমার কানের আর ঘাড়ের ওপরকার চুল যে শাদা হ'য়ে যাচ্ছে তা লুকোবার জন্যও বাবু-ছাঁট চালাতে হয়। ছিলো রং-বেরঙের জামা, যেন

আমার আগে-আগে নিশেনের মতো ঘোষণা করছে আমাকে ; এখন শুধু শাদা শার্ট পরি, সবচেয়ে নীরব রঙের প্যাণ্ট। আপিশের একটানা-আটঘণ্টা বসা কাজের জন্য কিছু চর্বি জমেছে শরীরে, মুখের ভাব ভারিক্কি। যদি বা আমার নাম কেউ মনে রেখে থাকে এখনো, চেহারা দেখে আমাকে শনাক্ত করা কারো পক্ষেই সহজ হবে না। তবু, ঈষৎ আহত হয়েছিলাম যখন হিমানী হোটেলের গোবিন্দবাবুও দেখামাত্রই চিনতে পারেননি আমাকে।

চৌরাস্তা থেকে ম্যাল রোড বরাবর ঢালু, নামার সময় পা দুটো নেচে-নেচে চলতে চায়, কিন্তু আমি চেষ্টা ক'রে আস্তে হাঁটছি, দেখছি চারদিকে তাকিয়ে। বেলা দশটার রোদ্দুরে মোড়া শহর, বারো বছর আগেকার রোদ্দুর—ফাঁকে-ফাঁকে লম্বা নীল ছায়া, ধাপে-ধাপে অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে, অনেক বাড়ি সিঁড়ি গাছপালার বেগনি সবুজ হলদে রঙে রাঙানো। বাঁয়ে ঐ মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেল, গম্বুজগুলো ছাতার মতো গোল, আর ডাইনে সারি-সারি দোকান—আপোলো ফার্মেসি, ফোটোজ় ফর অল্, ও. কে. স্টোর্স—নামগুলো আমার মনে আছে তা কিন্তু আমার মনে ছিলো না। এই তো মমতাজ কার্পেটস—গোল-টুপি-পরা ভাটিয়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে, একই লোক মনে হচ্ছে? শান্তারাম'স কিউরিওজ়—যেতে-আসতে জানলায় একটা চ্যাপ্টা-নাকের বুদ্ধমূর্তি দেখতাম, এখন সেখানে এক কুচকুচে কালো নটরাজ দাঁড়িয়ে। কিন্তু—হ্যাপি ট্র্যাভলস, স্ন্যাক্-বার, অজন্তা জুয়েলরি—এগুলো কোত্থেকে এলো, সেই খানদানি দর্জির দোকানটা তো দেখছি না কোথাও? আর স্যাভয় রেস্তোরাঁ—আগে বেম্বো নাম ছিলো না? চেনা অথচ অচেনা—যেন কোনো ভাড়াটে বাসায় ফিরে এসেছি, আমি ছিলাম সেখানে

কোনো-এক সময়ে, এখন যারা থাকে তারা অন্যভাবে সাজিয়ে নিয়েছে, আর আমি ভাবছি কেন চ'লে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কেমন ভয় হ'লো আমার—হিমানী হোটেলের হাত-বদল হয়নি তো? যদি গোবিন্দবাবুকে না পাই?

পোস্টাপিশ থেকে ডাইনে মোড়, আরো নিচে নামছি। এখন চেহারা বাঙালি ধরনের। শস্তা চায়ের দোকান, মফস্বলি ধরনের মনোহারি, হোমিওপ্যাথি, লুধিয়ানার পশমি কাপড়। পর-পর তিনটে রাস্তা বাজারের দিকে বেঁকে গেছে। রেল-স্টেশনের মোড় পেরিয়ে এসে আমি সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম।

অনেক বড়ো হয়েছে হিমানী হোটেল। দোতলা উঠেছে, লাগোয়া একটা লম্বা সরু বাংলো, বাগান ছোটো হ'য়ে গেছে। আমার ঘর—দোতলায় একটিমাত্র ঘর ছিলো তখন—আমি তাকিয়ে-তাকিয়ে সেটাকে আর খুঁজে পেলাম না। আমার পা দুটো যেন রাস্তায় আটকে গেছে, আমি মনে আনার চেষ্টা করছি ঠিক কী-রকম ছিলো তখন হিমানী হোটেল, মনে-মনে তৈরি ক'রে তুলছি দোতলার সেই ছোটো আর একলা ঘরটাকে, নীল-পর্দা-খাটানো জানলাটা, আর বাইরে দিয়ে সেই দশ-বারো ধাপ সিঁড়ি—সেটাও কি ভেঙে ফেলতে হ'লো? ··· থাক তাহ'লে, বরং ফিরে যাই, আমি এখন অন্য এক মানুষ, গোবিন্দবাবুর দেখা পেলেও তাঁকে আমার বলার কিছু নেই।

কিন্তু ম্যানেজারের ছোট্ট ঘরটিতে ঢোকামাত্র আমার মনে হ'লো, এই ঘরে কালও এসেছিলাম।

—'এই যে গোবিন্দবাবু, কেমন আছেন?'

ডাক এসেছে একটু আগে, হোটেলের চিঠি বেছে নিচ্ছিলেন ভদ্রলোক, মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে কিন্তু চোখে কোনো আলো

ফুটলো না। 'আপনি?...আপনি?...' আমি কথা না-ব'লে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, হঠাৎ তিনি চিঠি রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আ-রে! আ-পনি! ধীরাজবাবু! কতকাল পরে, কী সৌভাগ্য, আসুন আসুন।' সারা মুখে অনেক হাসির ভাঁজ ফেলে বললেন, 'হঠাৎ চিনতে পারিনি—কিছু মনে করবেন না, আপনার চেহারা—মানে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখছি আপনাকে—ভালো, ভালো—বড়ো আনন্দ হচ্ছে। বসুন।'

আমি বললাম, 'আপনি কিন্তু একই রকম আছেন।'

আমার গলার আওয়াজে যা প্রকাশ পেলো তার চেয়ে অনেক বেশি কথা আমার মনে। সত্যি একই রকম আছেন গোবিন্দবাবু—হুবহু এক। গোল ছাঁদের চওড়া মুখখানা একটুও ভাঙেনি, বারো মাস শীতের দেশে থাকার জন্য তাঁর গালের তামা-রং ফুঁড়ে লালচে আভা তেমনি ফুটে বেরোচ্ছে। মাথা-জোড়া টাক, চাঁদির ওপর চুলের গোছাটি ছোট্ট চুড়োর মতো আকৃতি ঠিক বজায় রেখেছে, যেন একটি চুলও বেশি অথবা কম নেই—আর পরনের ধুতি আর নস্যি-রঙের ভিয়েলার দুই-বুক-পকেটওলা শার্টটি পর্যন্ত একরকম। ঘরের সাজসজ্জাতেও কোনো বদল হয়নি—দরজার মুখোমুখি টেবিল, বাঁ-হাতি হোয়াট-নটে হোটেল-সংক্রান্ত খাতাপত্রগুলি, টেবিলের ওপর টেলিফোন, চিঠিপত্রের ফাইল, আর সেই পুরোনো পোর্টেবল রেমিংটনটা। টেবিল ঘিরে খানচারেক চেয়ার, দেয়ালে যে ফ্রেমে-বাঁধাই ছবি তিনখানা ঝুলছে তাও আমি চোখে পড়ামাত্র চিনতে পারলাম। দার্জিলিঙের দৃশ্য, কোনো অক্ষম চিত্রকরের আঁকা, একবারের বেশি দু-বার তাকাবার যোগ্য নয়, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার—ভালো লাগলো বললে ভুল হবে, সাধারণ 'ভালো লাগা'র চেয়ে বেশি কিছু, ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে আমার মন আশায় ভ'রে উঠলো।

আমার সব খবর নিলেন তিনি, আমাকে প্রায় দার্জিলিঙেরই নাগরিক ব'লে ধ'রে নিয়ে স্থানীয় সব খবর শোনালেন। এ-বছর মে মাসটা মাটি হ'য়ে গেলো বৃষ্টিতে—আসতে কিছু কম আসেনি লোকজন, কিন্তু দ্যাখ-না-দ্যাখ অর্ধেক ফাঁকা। তা কী আর হবে, আমরা ভাবি কত কিছুই, কিন্তু আসলে সবই তো হিশেবের বাইরে। 'ঐ তো প্রভঞ্জন মালাকার—এখানকার রাইডিং স্কুলে ট্রেনার ছিলো—শরীরটি বলবো কী যেন চাবুক, সবাই চেনে, লর্ড ব্রেবোর্ন পর্যন্ত হ্যাণ্ডশেক করেছিলেন—আর তাকে কিনা বাতে ধরলো হঠাৎ, ধরলো তো আর ছাড়ার নাম নেই, ডাক্তার বললো ঠাণ্ডা দেশে আরো খারাপ হবে, সব ছেড়ে-ছুড়ে কলকাতায় চ'লে যেতে হ'লো—আর সেখানেও অ্যালোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক কবরেজি সাত-সতেরো চিকিৎসা করিয়ে এতদিনে শুনছি বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলার যুগ্যি হয়েছে। আর নবীন ঘোষ—আপনি তার স্পঞ্জ-রসগোল্লা খেয়ে তারিফ করেছিলেন মনে আছে?—সে এখন বৃন্দাবনে ব'সে হরিনাম গাইছে। রমরমে চলছিলো তার "বেঙ্গল সুইটস", ওরই মধ্যে আমাকে একদিন বললো, "দাদা, কিছু ভালো লাগছে না, আমাকে যেন দড়ি দিয়ে টানছে কেউ।" বিবাগি হ'য়ে চ'লে গেলো লোকটা। এক শেঠজী কিনে নিলো তার দোকান, সেখানে এখন প্যাঁড়া মণ্ডা দিল্লির ডালমুট কাটছে। তাই তো বলি, ধন জন জীবন সবই অনিত্য, কিন্তু আমরা বুঝি না, মাছির মতো চিটচিটে রসে আটকে আছি।'

কথাটা ব'লে যেন খুশি হলেন গোবিন্দবাবু, সমর্থনের জন্য আমার দিকে তাকালেন। আমি কিছু বলার জন্যই বললাম, 'আপনার হোটেলের অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি।'

'কর্ম, ধীরাজবাবু, কর্ম করতে সংসারে এসেছি, যা পারি ক'রে

যাবো, আমি এর বেশি কিছু বুঝি না। ছেলেদের মতিগতি অন্যরকম, তারা কলকাতায় চাকরি করে, নেহাৎ মা-বাবার জন্য আসে এখানে মাঝে-মাঝে—দার্জিলিং তাদের কাছে প'চে গেছে। তারা আমার এই কাজটুকু রাখতে পারবে, এমন ভরসা 'তো আমার হয় না। এই হোটেল, জানেন, আমি পঁয়ত্রিশ বছর আগে শুরু করেছিলাম—কী-সব দিন দেখেছি! গবর্নর আসছেন সঙ্গে-সঙ্গে সব রাজা-উজির, রবীন্দ্রনাথ আসছেন সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার সব বড়োলোক ব্রাহ্মরা—আমি, জানেন, রবীন্দ্রনাথের মুখে কী যেন একটা গল্প পড়া শুনেছিলাম একবার—আহা, কী বাঁশির মতো গলা, আর দেখেও চক্ষু সার্থক। কোথায় গেলো সে-সব দিন!' নিশ্বাস ফেললেন গোবিন্দবাবু, একটু চুপ ক'রে থেকে আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন।—'তা, আপনি এবার বৌমাকে নিয়ে উইণ্ডামিয়ারে? কেমন লাগছে? ভালো? তা আমি বলি কী—তিন দিন বাদে আমার এখানকার সেরা ঘরটি খালি হবার কথা, যদি ইচ্ছে হয়—মানে, খরচ তো আদ্ধেক, আর বিলিতি খানারও ব্যবস্থা রেখেছি আজকাল।' হঠাৎ থেমে, একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, 'ভাববেন না খদ্দের ধরতে চাচ্ছি, লোকেরা এসে ফিরে যাচ্ছে রোজ, তবে আপনার কথা আলাদা, আপনি, মানে···সেবারে আপনাকে নিয়ে সেই মিটিং কেমন জমেছিলো মনে আছে?'

গোবিন্দবাবুর এই অনর্গল কথা আমি একমনে শুনে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিলো এগুলো যেন বাজে বকুনি নয়, যেন তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমারই বিষয়ে কিছু বলছেন আমাকে। দার্জিলিঙের গৌরবময় অতীত আমি চোখে দেখিনি অবশ্য—কিন্তু ঐ যে রাইডিং স্কুলের ট্রেনার, আর 'বেঙ্গল সুইটস'-এর নবীন ঘোষ, আরো কে-কে যেন, তাদের মনে হয় দেখেছিলাম এই ঘরটাতেই সন্ধের পরে কোনো-কোনোদিন: কয়েকটি

স্থায়ী-দার্জিলিংবাসী বাঙালি—উড়ো পাখি সাহেবের বাবু নয়—তাদের সুখদুঃখ চিন্তাভাবনা সবই অন্য ধরনের—আমি তাদের তখন বিশেষ লক্ষ করিনি, তাদের মফস্বলি কথাবার্তায় আমার হাসিও পেয়ে গেছে মাঝে-মাঝে। কিন্তু এখন এই গোবিন্দবাবুকে আমি অন্য দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি; তাঁর জীবন যে পরতে-পরতে দার্জিলিঙের সঙ্গে জড়িত, তাঁর যৌবনের স্মৃতিগুলিও যে এখানকার, শুধু এটুকুর জন্যই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি যেন। আর তাছাড়া, এই যে তিনি জীবন ভ'রে তাঁর হোটেলটি নিয়ে প'ড়ে আছেন, একই ভাবে একই নিয়মের মধ্যে কাটিয়ে দিচ্ছেন বছরের পর বছর, তাঁর আপিশ-ঘরের আসবাব পর্যন্ত একই ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন; তাঁর যে কিছুতে অরুচি ধরেনি, ক্লান্তি আসেনি; তাঁকে যে অন্য কোনো দিক থেকে 'দড়ি দিয়ে টানছে' না কেউ, এজন্যেও আমার কেমন শ্রদ্ধা হ'লো তাঁর ওপর, আমার নিজের চাইতে অনেক উঁচু দরের মানুষ ব'লে মনে হ'লো তাঁকে।

গোবিন্দবাবু চা আনালেন, আমি চুমুক দিয়ে বললাম, 'মিটিঙের কথায় মনে প'ড়ে গেলো। সেবারে আপনার হোটেলে একজনদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো আমার—'

'একজন মানে? সে তো অনেক—আপনাকে ছেঁকে ধরেছিলো, মশাই!' গোবিন্দবাবুর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো, কিন্তু পরের কথাটি বলতে গিয়ে গলা খাটো হ'লো তাঁর, ভাবটা যেন কোনো গোপন কথা বলছেন। 'তা, ধীরাজবাবু, সত্যি কি লেখা-টেকা ছেড়ে দিলেন—এত মিষ্টি হাত ছিলো আপনার! আমার গিন্নিঠাকরুন আবার নভেল-টভেলের পোকা জানেন তো, তিনি বলতেন আশ্চর্য, আজকাল কোনো পূজা-সংখ্যায় ধীরাজ দত্তর লেখা দেখছি না? আর এখন নাকি "জমদগ্নি" নামে কে একজন উঠেছে, গিন্নির কথায় আমিও প'ড়ে

ফেলেছিলুম একটা, ইয়া মোটা নভেল—বলবো কী মশাই রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুরু করেছিলুম, শেষ না-ক'রে ছাড়তে পারলুম না, তিনটে বেজে গেলো। কী কাণ্ড!' নাকের মধ্য দিয়ে শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন গোবিন্দবাবু, তারপর আমার দিকে গলা বাড়িয়ে বললেন, 'লোকটার আসল নাম কী বলুন তো?'

আমি হেসে বললাম, 'আমি জানি না। আমি আর ও-সবের মধ্যে নেই। মিসেস চৌধুরীর খবর কিছু জানেন নাকি? সেই যাঁরা হাফ-মাইল ক্রেসেণ্টে—'

অনেক টিপ্পনি, অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক চোখ-মুখের ভঙ্গি আর গলার আওয়াজের ওঠানামা-সমেত আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন গোবিন্দবাবু—'ভালো ঘরের মেয়ে, ভালো ঘরের বৌ—কী আর বলবো'—এই মন্তব্যটি মাঝে-মাঝেই শোনা যেতে লাগলো। আমি নিঃশব্দে শুনে গেলাম; কোনো-কোনো খবর আগে থেকেই আমার জানা ছিলো, দু-একটা নতুন। হরেন চৌধুরী আর তাঁর স্ত্রী এই 'কেলেঙ্কারি'টাও মেনে নিয়েছিলেন—'মা-বাবা হবার কী ফ্যাশাদ ভাবুন, গেলাও যায় না, ফেলাও যায় না'—কিন্তু মৃণালিনী চৌধুরী যখন মারা যান তখন কন্যা-রত্নটি প্যারিসে না হলিউডে না কোথায় যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডিপথেরিয়া ব'লে ডায়াগনোসিস হয়েছিলো—বছর পাঁচেক আগেকার কথা—কিন্তু ইঞ্জেকশন নেবার তিন দিন পরে সারা শরীর ফুলে উঠলো হঠাৎ, গলা বুজে গেলো, চোখ বন্ধ—'সে এক দৃশ্য, মশাই, আমি ছুটে গিয়েছিলাম খবর পেয়ে, দেখে চোখের জল চেপে রাখা যায় না। হরেন ডাক্তার প্রাণান্ত করলেন সারাটা রাত, কিন্তু ভোরবেলা হার্টফেল করলেন ভদ্রমহিলা। চিকিৎসায় ভুল হয়েছিলো নিশ্চয়ই, নয়তো ও-রকম হবে কেন—আর হরেনবাবু নিজে এতকালের অভিজ্ঞ ডাক্তার, কী কাণ্ড ভেবে

দেখুন। তাই তো বলি—এই যে এত নিত্যিনতুন ওষুধ বেরোচ্ছে, সায়ান্স নিয়ে হলুস্থুল চলছে চারদিকে, তবু আসলে তো নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে আমাদের, কিন্তু আমরা বুঝি না, বুঝেও বুঝি না। এমন চমৎকার মানুষ ছিলেন ওঁরা, যাকে বলে একটি সুখী পরিবার তা-ই—দেখতে-দেখতে কী হ'য়ে গেলো, কোথায় রইলো অত আদরের মেয়ে, এদিকে হরেনবাবু ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে কাশীবাসী হলেন।'

গোবিন্দবাবু আমাকে গগন মুন্সির খবর দিতেও ভুললেন না। তিনি দার্জিলিঙে এসেছিলেন গেলো বছর—তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ আর দ্বিতীয় পক্ষের দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, উঠেছিলেন হিমানী হোটেলেই, ভুটান সীমান্তে একশো একরের একটি এলাচ খেত কিনে ফিরে গেলেন। 'আপনি কি জানেন তিনি খাদ্য-মন্ত্রী ছিলেন বিহারে? তাঁর বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম, 'আর সেই বাড়ি? চন্দ্রকোণা?'

'সেটা খালি প'ড়ে আছে।'

হোটেলে ফিরে দেখি, বাগানের দোলনায় দুলছে কমলা, আর টবলু কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে আর বলছে, 'তুমি নামো, মা! এবার আমি!' তখন প্রায় দেড়টা বেলা, বাগানে আর লোক নেই, হোটেলের লাঞ্চ শুরু হ'য়ে গিয়েছে—কলকাতার ফ্ল্যাট ছেড়ে এসে এই খোলা হাওয়ায় আকাশের তলায় কমলা তার শরীরটাকে আরো ভালোবাসছে যেন, তার সঙ্গে ঐ দোলনাটার খুব ভাব হ'য়ে গিয়েছে—রোদ্দুরে আর ব্যায়ামজনিত রক্তচলাচলে তার গালের রং টুকটুকে লাল। 'বেশ

লোক !' দোলনায় ব'সেই আমার দিকে ভুরু বাঁকালো সে, 'ব'লে গেলে এই আসছি, তারপর আর পাত্তাই নেই।' মুখে হাসি টেনে আমি বললাম, 'তোমরা এতক্ষণ কী করলে?' 'কী আর করবো, ঘুরে বেড়ালাম আবোলতাবোল খানিকক্ষণ—এত সুন্দর এক-একটা রাস্তা না—আশ্চর্য জায়গা, সত্যি! জানো, আজ একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো, আমার এক পুরোনো ছাত্রী—বিয়ের পরে কী মুটিয়েছে, বাব্বাঃ!' দোলনার দড়িতে আস্তে চাপ দিলো কমলা, একটি হাসি ছুঁড়ে দিলো আমার দিকে, তার একটি পা থেকে খ'সে পড়লো স্যাণ্ডেল, অন্যটি সে ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে দিলে, তার পায়ের পাতা দুটি রাঙানো নখ নিয়ে শূন্যে উঠে গেলো, তার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত হেলে পড়লো পেছন দিকে, তার শাড়ির তলায় পেটিকোটের গোলাপি সাটিন ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

৪

হিমানী হোটেল থেকে হাফ-মাইল ক্রেসেন্টে যাবার দুটো রাস্তা আছে—একটাতে ম্যাল রোড থেকে উনতিরিশ ধাপ সিঁড়ি উঠে ডাইনে যেতে হয়—এটা কাছের পথ—অন্যটা হিমানী হোটেল ছাড়িয়ে জলা-পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে ; আমি ঘুর-পথটাই নিলাম। এ-পথে চলা-চলতি কম, বাড়ি অল্প, অর্ধেক পথে একটা হাওয়া-ঘর পাওয়া যায়, আমি বসলাম সেখানে কয়েক মিনিট, আমার তাড়া নেই—এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি হাফ-মাইল ক্রেসেন্টের শেষ অথবা আরম্ভ, চুড়োর মতো উঁচুতে, দুটো পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে ঢালু-ছাদওলা বাড়িটার আভাস, রাস্তায় রোদের ওপর ছায়াগুলো কাঁপছে—চুপচাপ এই দুপুর-বেলায়, আমি একলা, কোনো শব্দ নেই শুধু মাঝে-মাঝে পাইনের ডালে ঝিরঝির, আমি ছাড়া রাস্তায় কোনো লোক নেই শুধু একটি ভুটিয়া মেয়ে বাচ্চা-পিঠে চ'লে গেলো—আমার সামনে কচ্ছপের পিঠের মতো

জমির ওপর বাড়িটা, একটা দিক অন্যটার চেয়ে নিচুতে, আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি ছাড়া লোক নেই রাস্তায়, আমার অবাক লাগছে। আগে কখনো মনে হয়নি এই রাস্তা এত নির্জন, এই বাড়িটা এত একলা, এত দূরে···বাইরে···যেন সব মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে···যেখানে থাকবার কথা সেখানেই আছে, কিন্তু অনুপস্থিত। দরজা বন্ধ, জানলাগুলো ভারি পর্দায় মোড়া, সামনের বাগান বুনো হ'য়ে যাচ্ছে, বাইরের হলুদ রং প্রায় ধূসর। শুধু ফটকের গায়ে শ্বেতপাথরের ওপর লেখাটা এখনো স্পষ্ট—'চন্দ্রকোণা'—যেহেতু রাস্তাটা এখানে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা, আর তার একদিকের ডগাটুকুর ওপরেই তাঁর বাড়ি, তাই ঐ নাম দিয়েছিলেন মৃণালিনী। আমি অক্ষরগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে গেলাম কয়েকবার, আমার গলা থেকে আস্তে একটি শব্দ বেরিয়ে এলো—'রুক্মি!' হাওয়ায় উড়ে গেলো সেই নাম, শুকনো পাতার মতো খ'সে পড়লো। একটি ছোট্ট মেঘ উঠে এলো হঠাৎ, কুয়াশায় ঝাপসা হ'য়ে গেলো ঝাড়িটা, আর আমি সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে অন্য এক দৃশ্য দেখতে পেলাম। একটি দগদগে লাল সোয়েটার-পরা ঝাঁকড়া চুলের যুবক উঠে দাঁড়িয়েছে, বক্তৃতা করছে একঘর লোকের সামনে।

'আমি বক্তৃতা করতে পারি না, একটু-একটু লিখতে পারি হয়তো। সাহিত্য ব্যাপারটা কী, কেন অমুক বইটা ভালো আর তমুক বইটা ভালো নয়, আমি তার কিছু বুঝি না। ও-সব নিয়ে কোনো মাথা-ব্যথাও নেই আমার। আমি বুঝি, যেমন কারো রুইমাছের কালিয়া ভালো লাগে আর কারো বা সর্ষে দিয়ে ভাপানো ইলিশ, বা একই লোকের কখনো ইচ্ছে করে মালাই-কারি আর কখনো বা শুক্তো-ঝোল—এই বই ভালো-মন্দ লাগার. ব্যাপারটাও

ঠিক তেমনি। আদ্যিকাল থেকেই সমালোচনা নামে একটা ব্যাপার নাকি চ'লে আসছে এই পৃথিবীতে, কিন্তু সেটা কোন কাজে লাগে আমি তা ভেবে পাই না, কেননা বই পড়ার চাইতে ভালো কিছু যখন করার থাকে না, শুধু তখনই লোকেরা বই প'ড়ে সময় কাটায়।...'

এখানে শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু হাসির শব্দ হ'লো, আমি সেটা আশাই করেছিলাম। এই কথাগুলো, প্রায় এই ভাষাতেই, আমি অনেকবার বলেছি আগে—কুলটিতে, গৌহাটিতে, জামশেদপুরে, বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবে, মহম্মদ আলি পার্কে সাহিত্য-মেলায়, আরো কোথায়-কোথায় মনে নেই। প্রথম-প্রথম—প্রায় সকলেরই যা হয়—লোকের সামনে কিছু বলতে হ'লে আমার গলা আটকে আসতো, এমনকি পা কাঁপতো একটু-একটু, কিন্তু এগুলো কাটিয়ে উঠতে বেশি দেরি হয়নি আমার, তারপর দেখলাম আমি আমার আড্ডাবাজ হালকা ধরনে কথা বললে লোকেদের বেশ পছন্দই হয়। অনেক সভাতেই একটি ক'রে বিদ্বান ব্যক্তি আহূত হ'য়ে থাকেন—এই প্রোফেসর-ট্রোফেসর ধরনের, কিন্তু আমি দেখেছি তাঁদের কথা যেন ভদ্রতা ক'রে শোনে লোকেরা, আমি বলতে শুরু করলেই একটা হাওয়া ব'য়ে যায়। লোকেরা জ্ঞান চায় না, আমোদ চায়। আস্তে-আস্তে আমার মুখে একটি বাঁধা বক্তৃতা তৈরি হ'য়ে গেলো, কোনো সভায় যাবার আগে আর ভাবতে হয় না কী বলবো।

'একটা কথা অনবরত শোনা যায়—সাহিত্যের একটা স্থায়ী মূল্য আছে। শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের তা-ই ধারণা ছিলো। তা

তাঁর কথা আলাদা, তিনি ছিলেন মুনিঋষি গোছের মানুষ, কিন্তু তাঁর দেখাদেখি অন্য অনেকে যখন সাহিত্যের "স" বলতেই তত্ত্বকথার ধোঁয়া ছড়াতে থাকেন, তখন আমার যেন দম আটকে আসে। এমনভাবে তাঁরা কথা বলেন যেন একেবারে স্বর্গের চাবি হাতে পেয়ে গেছেন, সেখানে এক কামরায় ব'সে আছে "সত্য", আর-এক কামরায় "সৌন্দর্য"—সেগুলোকে তাঁরা ব'লে থাকেন "চিরন্তন"—সেখানে কোন লেখককে ঢুকতে দেয়া যায় আর কাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতে হবে, তা নিয়ে তাঁদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু আমি, আর আমার সমবয়সী অন্য লেখকেরা—আমরা, জানেন, ও-সব চিরন্তন-ফিরন্তন ব'লে কিছু মানি না। আসছে, যাচ্ছে, বদল হচ্ছে—এই একটা খেলা চলছে সারাক্ষণ। কেন, কেউ জানে না।'

এ-পর্যন্ত ব'লে আমি থামলাম একটু, ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। শুরুতে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি লোক মনে হ'লো। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েও আছে কয়েকজন—তাদের মধ্যে একটি মেয়ে, কালো স্কার্ফের তলায় সূর্যমুখী রঙের ব্লাউজ় দেখা যাচ্ছে। সামনের চেয়ারগুলোতে সব কলকাতার লোক—পুরুষদের পরনে ঝকঝকে স্যুট, আর মেয়েদের পিঠের ওপর নানা রঙের নানা ছাঁদের স্টোল ফেলা—সে-বছর কলকাতার ফ্যাশানের হাটে স্টোল জিনিশটা খুব উজিয়েছিলো; পেছনের সারিতে চাঁদমারির আলোয়ান-জড়ানো বাঙালি বাবুরা, সঙ্গে তাদের মোটাসোটা গিন্নিরা, পান-দোক্তার জন্য ঠোঁট কালো হ'য়ে গেছে যাদের, আর দশ বছর আগেকার কায়দায় খোঁপা-বাঁধা তাদের কতিপয় বালিকা বা আধা-যুবতী কন্যা। কোণে

একটি চেয়ারে ব'সে গোবিন্দবাবু সারা মুখে হাসছেন। আমার জন্য মিটিং ডাকার বুদ্ধিটা তাঁরই ('এখানকার বাঙালিরদের এ-রকম সুযোগ তো বড়ো হয় না, আপনাক কিছু বলতে হবে, ধীরাজবাবু !'), হোটেলের খাবার ঘরটা খালি ক'রে দিয়ে ভেনেস্তা চেয়ার সাজিয়ে ব্যবস্থা করেছেন—কিন্তু এত লোক হবে তিনিও বোধহয় আশা করেননি, কেননা সীজ়নের বাবুরা ঠাণ্ডার ভয়ে বা সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে সন্ধের পরে আর বেরোতে চান না, আর খবরটা শুধু মুখে-মুখে রটেছিলো, আর চৌরাস্তায় দুটো পোস্টার দিয়েছিলেন। আমি নিজেও একটু খুশি হয়েছিলাম সামনের দিকে চৌরাস্তার ফ্যাশানবতীদের দেখতে পেয়ে, আর এমন কয়েকজন উত্তম সাহেবকে, জিমখানা ক্লাবে মদে ব্রিজে সন্ধে কাটানো যাঁদের অভ্যেস—অন্তত দেখে তা-ই মনে হয়। আমি উৎসাহ পাচ্ছি, বেশ ভালো লাগছে বলতে, নিজেকে বেশ চালাক-চালাক মনে হচ্ছে।

'আমার কাছে কথাটা খুব সোজা। মানুষ তার অবসর কাটাবার জন্য হরেক রকম জিনিশ বানিয়ে নিয়েছে—তারই একটা হ'লো সাহিত্য, আর অন্য সব-কিছুর মতো তারও রকমফের হ'য়ে থাকে। আগে ছিলো গোরুর গাড়ি, এখন ট্রেনে মোটরে যাতায়াত করি আমরা—তেমনি লেখার ধরনও বদলে যায়, অনবরত বদলে যাচ্ছে। এই হ'লো একটা দিক, আর-একটা কথা হ'লো—আমরা যারা কৈশোর কাটিয়েছি দ্বিতীয় যুদ্ধের মধ্যে, স্বাধীনতার পরে সাবালক হয়েছি, আমাদের জগৎটা অন্য রকম, ভালো-মন্দ বলতে আমাদের বাবারা যা বুঝতেন আমরা তা বুঝি না। আগে কতগুলো বিশ্বাস ছিলো লোকেদের—ভগবান,

ভূত, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, আরো কত কী—ওগুলো শুনলে বাচ্চা ছেলেরাও হাসে আজকাল, আমরা কেউ হ্যামলেটের অবস্থায় পড়লে ভূতের কেত্তন আমাদের এক কানে ঢুকে আর-এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেতো। আমার জ্যাঠামশাইকে শুনতাম তাঁর "দেশের বাড়ি" নিয়ে সাত কাহন পাঁচালি গাইতে—খুলনা জেলায় তাঁদের সেই গ্রাম, দত্ত বংশের ভিটেমাটি, যা ছেড়ে পার্টিশনের পরে তাঁকে চ'লে আসতে হয়েছিলো — আমি বুঝতেই পারতাম না ব্যাপারটা কী, কলকাতা তো অনেক বেশি ভালো জায়গা। "বংশ", "দেশ-গাঁ" — কী অর্থ হয় এ-সব কথার? এই আমি আছি—আর আপনারা আছেন, আলাদা-আলাদা এক-একটা মানুষ—সত্যি বলতে তা ছাড়া তো আর-কিছু নই আমরা। আর আমাদের এই "আমি"গুলিও প্রত্যেকে একটি অদ্ভুত জীব; একই দিনে অনেক রকম উল্টোপাল্টা কাজ ক'রে ফ্যালে সে; ভিখিরিকেও পয়সা দেয়, আবার বাস্-ভাড়াও ঠকায়; গান শুনে চোখের জল ফ্যালে, আবার ফুচকা দেখলে জিভের জলও সামলাতে পারে না (তরুণীদের জোর হাসি)। আর অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক—তাও সেই রকম; এই জোড়া লাগছে এই ভাঙছে, কখনো ভাবছি সে ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু ভুলে যেতেও দেরি হচ্ছে না—ভারি মজার। অনেকে বলেন আমার লেখা এলোমেলো, ঠিকমতো শেষ হয় না—কিন্তু জীবনটাই যদি এলোমেলো হয় তাহ'লে আমার আর দোষ কী। এই কথাটা আগেকার দিনের লেখকেরা মানতেন না, তাঁরা লিখতেন গোলগাল প্লটওয়ালা গল্প, সুন্দরভাবে সাজাতেন সুখ দুঃখ মিলন বিরহ ইত্যাদি—কিন্তু আমরা কোথাও কোনো নিয়ম দেখতে পাই না,

দেখতে পাই কতগুলো অ্যাক্সিডেণ্ট শুধু, হঠাৎ-হঠাৎ হ'য়ে যাচ্ছে বা হচ্ছে না—একটার সঙ্গে আর-একটার কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু টুকরো, শুধু ভাঙাচোরা…'

মিনিট কুড়ি বক্তৃতা ক'রে আমি থামলাম, এক মিনিট লম্বা হাততালি হ'লো, এটা-ওটা প্রশ্ন করলেন কেউ-কেউ। 'আপনার ওপর কোনো বিদেশী লেখকের প্রভাব আছে কি?' 'মাপ করবেন, আমি বইপত্র বেশি পড়ি না।' 'আপনার "তিন রাত্রি"র নায়িকার কোনো মডেল আছে ব'লে শোনা যায়। তা কি সত্যি?' 'সত্যি হ'লেই বা বলবো কেন আপনাদের।' (মৃদু হাসি এখানে-ওখানে।) 'উপন্যাস কী ক'রে লিখতে হয় একটু বলবেন?' 'দিস্তে-দিস্তে কাগজ কিনতে হয়, আর কালি, আর অবশ্য ফাউণ্টেন পেন একটি।' (জোর হাসি।) 'আপনার সবচেয়ে প্রিয় বাঙালি লেখক কে?' 'ধীরাজ দত্ত।'—হাসির রোল উঠলো এবার, তারপর এক ঝুড়ি অটোগ্রাফ খাতা ('কিছু লিখে দিন—না, লিখতেই হবে!')—মেয়েদের চোখ, এঁকে-বেঁকে চলার ভঙ্গি, পাইপের ধোঁয়া, লাইটারের শব্দ, কাঠের মেঝের ওপর জুতোর শব্দ—আস্তে-আস্তে ঘর ফাঁকা হ'য়ে গেলো। এখন আমার প্রথম কাজ গলা ভেজানো, গোবিন্দবাবুর উচ্ছ্বাস এড়িয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছি—বারান্দায় হঠাৎ একজন এগিয়ে এলো আমার দিকে—কালো শালের তলায় সূর্যমুখী রঙের ব্লাউজ় আমার চোখে পড়লো।

—'আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন মানুষের জীবনে স্থির ব'লে কিছু নেই?'

মেয়েদের মুখে এ-সব পাকা কথা শুনলে আমার রাগ ধরে। তক্ষুনি

যা মুখে এলো তা-ই বললাম, ‘আমি কিছুই বিশ্বাস করি না, অবিশ্বাসও করি না।’

‘শুধু বলার জন্যই কথা বলেন ?’

ও, তাহ’লে তর্কের অছিলায় ভাব জমাতে চায় ? আমি ভালো ক’রে তাকালাম তার দিকে, কিন্তু তার চোখে-মুখে কোথাও দেখলাম না সেই সব ঝিকিরমিকির, ইচ্ছে আর লজ্জা মেশানো সেই উড়ুক্কু ভাব, যার প্রদর্শনী অনেক দেখেও আমার ঠিক অরুচি ধরেনি এখনো। আমি একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার দিকে—তার বাদামি চোখে চোখ পড়লো আমার, মনে হ’লো তার ফর্শা গালের ওপর সরু একটি নীল শিরা যেন কাঁপছে, আর দুই ভুরুর মধ্যিখানে ঐ যে তার কপাল ঈষৎ কুঁচকোনো, তা যেন আমাকে কিছু-একটা মনে করিয়ে দিতে চায়। জিগেস না-ক’রে পারলাম না, ‘আমি কি আপনাকে আগে কোথাও দেখেছিলাম ?’ উত্তর এলো : ‘আমি রুক্মি।’

৫

তখন আমার বয়স একুশ, কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা অখাদ্য স্কুল-মাষ্টারি করছি, সঙ্গে এক-আধটা ট্যুশনিও, দাদার মনরক্ষার জন্য আইনের ক্লাশে নাম রেখেছি কিন্তু বিশেষ যাই-টাই না—সন্ধেটা কাটে বালিগঞ্জে সুখময়দের আড্ডায়, তারা 'শতাব্দী' নামে একটা 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' চালাচ্ছে (সত্যিকার 'লিট্‌ল'—কুড়ি-চব্বিশ পৃষ্ঠার বেশি থাকে না), তাদেরই জন্য ভাঙা ছন্দের কবিতা লিখি মাঝে-মাঝে, আর ছোটো-ছোটো অদ্ভুত ধরনের গল্প, মাঝে-মাঝে প্রেসের বিল মেটাবার জন্য দু-দশ টাকা চাঁদাও দিতে হয় আমাকে—জীবনটা মন্দ লাগছে না মোটের ওপর, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখছি, বন্ধুমহলে পিঠ-চুলকোনি জুটছে, বোলচাল শিখছি, পাখা গজাচ্ছে একটু-একটু ক'রে, কিন্তু যাকে বলে 'হাড্ডি-পাকা' তা হ'য়ে যাইনি তখনও—

এ-রকম সময়ে রুক্মিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। রুক্মির তখন বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে।

ছেলেবেলা থেকে মা-র ঘরে একটা গ্রুপ-ফোটো দেখে আসছি—আমার জন্মের আগেকার মা আর বাবা (নজর করলে চেনা যায় কিন্তু অদ্ভুত লাগে), আর তাঁদেরই বয়সি আর-এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী। স্টুডিওতে তোলা সাজানো ছবি—মহিলা দু-জন আঁচলে ব্রোচ এঁটে নিচু-পিঠওলা গোল চেয়ারে ব'সে আছেন, তাঁদের মাথার চুলে পাতা-কাটা সিঁথি, অর্ধেক মাথা আঁচলে ঢাকা, তাঁদের গলায় লকেটওলা হার আর হাতে অনেকগুলো ক'রে চুড়ি, আর পেছনে দুই স্বামী দাঁড়িয়ে—গোঁফ, কাঁধে উড়ুনি, চাঁদির ওপর লেপ্টে-থাকা ছাঁটা চুল, দু-জনেই হাতের ছড়িটি এমনভাবে ধ'রে আছেন যাতে ছবি থেকে বাদ না পড়ে। ডিগবয়তে থাকার সময় খুব বন্ধুতা ছিলো দুই পরিবারে—একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া বেড়ানো ইত্যাদি, পুজোর কাপড় গানবাজনা ইত্যাদি ('সুন্দর গলা ছিলো মৃণালিনীর')—কিন্তু হরেন ডাক্তার তেল-কোম্পানির চাকরি ছেড়ে বর্মায় চ'লে গেলেন, বাবাও বদলি হলেন কিছুদিন পরে, তবু দেখা হয়েছে মাঝে-মাঝে বাবা বেঁচে ছিলেন যদ্দিন, আর বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে কেমন আত্মীয়ের মতো চিঠি লিখেছিলেন ওঁরা—এ-সব বৃত্তান্ত, আমি যখন ছোটো এবং অসহায়, মা আমাকে অনেকবার শুনিয়েছিলেন—আজকাল আর বলেন না, তাঁর পুরোনো কথার সঙ্গী হবার জন্য বাবা আর নেই, অন্য কারো সময় নেই তা বলা বাহুল্য, ছবির ফ্রেমে তাঁর যৌবন হলদে হ'য়ে আসছে। কিন্তু একদিন সেই ঝাপসা অতীত জ্বলজ্যান্ত হ'য়ে ফিরে এলো।

স্কুল সেদিন ছুটি ছিলো বোধহয়, বা আমি কামাই করেছিলাম, ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে বিকেলবেলা আমি বেরোতে যাচ্ছি, বাড়ির

সামনে একটা ট্যাক্সি থামতে দেখে দাঁড়ালাম। আমার অচেনা তিনজন নামলেন সেটা থেকে—তামাটে রঙের সুশ্রী মুখ আর কাঁচা-পাকা চুল নিয়ে একটি ভদ্রলোক, টানা চোখের পাৎলা ঠোঁটের এক প্রৌঢ়া মহিলা, আর অন্যজন যে তাঁদেরই মেয়ে তা দেখেই বোঝা যায়, যেন মা-বাবাকে মিশিয়ে তৈরি। ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে জিগেস করলেন, 'এটা কি সুপ্রকাশ দত্তর বাড়ি?···তুমি তাঁর ছোটো ছেলে তো? মা-কে গিয়ে বলো হরেন চৌধুরী এসেছে।' আমাকে বলতে হ'লো না, নামটা কানে যাওয়ামাত্র মা ছুটে এলেন, এত খুশি যেন বয়স ক'মে গেছে। আমাকেও ধ'রে রাখলেন জোর ক'রে; হরেন-মৃণালিনীর কন্যাকে দেখে আমার নাড়ি একটু চঞ্চল হ'লো।

এতদিন পরে ঠিক মনে করতে পারছি না রুক্‌মির সঙ্গে আমার কী-রকম সম্পর্ক ছিলো সেই সময়ে—সে কি স্নায়ুর একটু কাঁপুনি শুধু, না কি দু-একটা মুহূর্ত তার সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রেও নিতে পেরেছিলাম? ঘনিষ্ঠতা কোনোমতেই বলা যায় না, কিন্তু একেবারে হালকা মেলামেশাও নয়, আমার পক্ষে কিছুটা হয়তো অস্বস্তিকর—কিন্তু ব্যাপারটা কী হচ্ছে বা হ'তে পারতো আমি তা বুঝিনি, কিছুই আমি বুঝতাম না তখন, বুঝতে চাইতাম না। যাই আসি মাঝে-মাঝে হঠাৎ, যে-কোনো সময়ে—আমি যখন আড্ডা-ছুট, বা সে-মুহূর্তে অন্য কোথাও যাবার নেই, বা ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে একটু গা জিরোবার মন হয়েছে যখন ···কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিই ওদের বণ্ডেল রোডের বাড়িতে (বাস্‌-রাস্তার কাছেই, আর আমার যাওয়া-আসার পথে পড়ে ব'লে আরো সুবিধে)—এমনি চলেছিলো মাস দুয়েক ধ'রে, আমার পরিচয় যখন স্কুলমাস্টার আর পঞ্চাশের-মধ্যে-একজন 'তরুণ কবি' শুধু ('কবি'র চেয়ে 'তরুণে'র অংশটা অনেক বড়ো, যেন অল্পবয়সী হবার মধ্যেই বিশেষ কোনো গৌরব

আছে !)—যেমন আমার স্বভাব ঢিলেঢোলা তেমনি ঐ বাড়ির হালচাল, অনেক লোক আসছে যাচ্ছে অনবরত, যখন-তখন চা মিষ্টির ছড়াছড়ি, এমন দিন যায় না যখন দুপুরে বা রাত্রে কাউকে খেতে বলা হয়নি, আর আমি—আমাকে তো ওঁরা কয়েকদিনের মধ্যেই 'ঘরের ছেলে' ক'রে নিয়েছেন। আত্মীয় নয়, অথচ আত্মীয়েরই মতো ; নতুন চেনা, কিন্তু মা-বাবাদের অতীতের জন্য অনেকগুলো সিঁড়ি আগেই পেরোনো হ'য়ে গেছে—যাকে বলে 'প্রেমে পড়া' বা 'প্রেম করা' তার পক্ষে চমৎকার সুযোগ, আমি অনেকবার ভেবেছিলাম সে-কথা, আমাকে দেখলে রুক্মি খুশি হয় তা বুঝেছিলাম, আমার পুরুষের রক্ত ছলাৎ ক'রে উঠেছে অনেকবার, তবু···এগোতে পারিনি—বা ইচ্ছে ক'রেই এগোইনি হয়তো, ওর বিয়ে হচ্ছে শুনেই আমার উৎসাহ মীইয়ে গিয়েছিলো। ঐ ব্যাপারটাকে তখনও একটা চরম কিছু ব'লে ভাবতাম আমি (বিয়ে হ'লেই মেয়েরা 'ফোকাসের বাইরে' চ'লে যায়, এই একটা রসিকতা ছিলো আমাদের দলে), আর বিবাহিত আর বিয়ে-ঠিক-হ'য়ে-যাওয়া মেয়ের মধ্যে তফাৎ তেমন বেশি তো নয়, দু-দিন বাদে রুক্মি কোথায় চ'লে যাবে তা জানার জন্যেও কোনো ইচ্ছে নেই আমার।

তাছাড়া অন্য কারণও ছিলো!

হরেন ডাক্তার অর্ধেক জীবন বর্মায় কাটিয়েছেন, জাপানি বোমার তাড়া খেয়ে চ'লে এসেও ছ-মাস বাদে আবার ফিরে যান, কিন্তু কয়েক বছর পরে, মেয়ে যখন বড়ো হ'য়ে উঠছে, আর তিনি দেখলেন সে এখনো বাংলা লেখাপড়ায় খুব কাঁচা, এদিকে বর্মার বাঙালিরাও তল্পি গুটোচ্ছে একে-একে, তখন—যদিও মন্ত্রী থেকে মজুর পর্যন্ত সকলেই ভালোবাসতো তাঁকে, ডাক্তারিতে পসার ছিলো খুব, গরিবের বন্ধু ব'লে সুনাম ছিলো, তবু মায়া কাটিয়ে চ'লে এলেন একদিন, মেয়েকে দু-বছর শান্তিনিকেতনে

রাখলেন বাংলাটা রপ্ত করাবার জন্য, নিজে চাকরি নিলেন কার্সিয়ং অঞ্চলে রোংটু ভ্যালি চা-বাগানে, তাঁর পক্ষে নেহাৎ অযোগ্য এক চাকরি—টাকার জন্য নয় (কেননা অনেক লোকশান ক'রেও বর্মা থেকে যা আনতে পেরেছিলেন তা-ই মুনফায় খাটালে বাকি জীবন চ'লে যেতো), কিন্তু কিছু না-ক'রে টিকতে পারেন না ব'লে—রোংটুতে একটি বিনি-পয়সার হাসপাতালও শুরু করেছেন। এ-সব খবর আমি কিছু মা-র কাছে, কিছু রুক্মির কাছে পেয়েছিলাম—'ভাগ্যে চ'লে এসেছিলেন, নয়তো কি আর ঘরে-বরে বিয়ে দিতে পারতেন মেয়েকে!'—মা-র এই কথাটা আমার কানে লেগে আছে।

বহুকাল বাইরে ছিলেন, কত পুরোনো মানুষকে কুড়ি বছরের মধ্যে চোখে দ্যাখেননি, কত সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে—মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সে-সবের ক্ষতিপূরণ করছেন হরেন-মৃণালিনী। বিয়ের তারিখ জ্যৈষ্ঠের শুরুতে কিন্তু চৈত্রমাস থেকেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন কলকাতায়, (হরেনবাবু রোংটু থেকে যাওয়া-আসা করছেন)—কোথায় আত্মীয়, কোথায় কুটুম্ব, কারা-কারা বেঁচে আছে বা নেই, সম্পর্কে বৌ বা জামাই হয় এমন কাকে-কাকে তাঁরা এখনো চোখে দ্যাখেননি, এ-সব নিয়ে গবেষণা চলছে রীতিমতো। কলকাতার মধ্যে ঘোরাঘুরি, দূরে কাছে চিঠি লেখা, পাকিস্তানে যে-খুড়তুতো ভাই প'ড়ে আছে তাকে কী ক'রে আনানো যায়—সব দিকে নজর রাখছেন ওঁরা, মা-র ভাষায় 'সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে ধুমধাম—আহা, করবে না! একটাই তো মেয়ে।'

বিয়ের একমাস আগে থেকেই নায়র-নায়রী আসতে লাগলো। সকলের আগে পাকিস্তানের খুড়তুতো ভাই, খেত-খামার নিয়ে বারোমাস তাকে খাটতে হয় সেখানে, আর এখন একেবারে ঢালাও আরামে ডুবে আছে বৌ ছেলেপুলে নিয়ে; একটি বৃদ্ধা যার সেবার জন্য আলাদা

একটি দাসী রাখতে হ'লো; মালদা থেকে বিপত্নীক এক বৃদ্ধ এলেন বিধবা মেয়ে আর নাৎনিকে সঙ্গে নিয়ে—আরো কারা-কারা যেন, তেতলা বাড়িটা ভর্তি;—কোনো ঘরে জোর চলছে তাস, কোনো ঘরে বারোটা বেলায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে খবর-কাগজ পড়ছে কেউ, কোথাও কোনো বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে হার্মোনিয়মের সঙ্গে কুস্তি করানো হচ্ছে—হরেক রকমের কাজের আর কুঁড়েমির আওয়াজে বাড়িটা যেন গমগম করছে সারাক্ষণ। বলা বাহুল্য, যুবতী মেয়েও আছে অনেকগুলো—বলা বাহুল্য, কিছুই তাদের করার নেই—যখন-তখন খাচ্ছে আর গুলতানি ক'রে বেড়াচ্ছে, কখনো সিঁড়িতে, কখনো বারান্দায়, কখনো কোনো ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে আমার দেখা হ'য়ে যাচ্ছে তাদের কারো-না-কারো সঙ্গে—আর সেটাও একটা কারণ, যেজন্যে রুক্মির দিকে আমি তেমন মন দিতে পারিনি। আর তার ওপর, তাকে যে আমার অত্যন্ত বেশি ভালো লাগছে তাও নয়। সে যে দেখতে ভালো তাতে সন্দেহ নেই, তার চামড়ার রং এমন এক ধরনের ফর্শা, যাকে কাব্যিক ভাষায় 'ম্লান' বলা যায়, তার গালের ওপর নীল একটি শিরা মাঝে-মাঝে ফুটে ওঠে, তার বাবার মুখের লাবণ্যের সঙ্গে মায়ের টানা-টানা বাদামি রঙের ভরপুর চোখ সে পেয়েছে। কিন্তু শুধু চেহারা দিয়ে তো মানুষ হয় না—স্বাদ-সোয়াদও চাই। রুক্মির রূপ আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার কাছে, কিন্তু তার ধরনধারন আমার অদ্ভুত ব'লে মনে হয়।

আমি সর্বদা ব'লে থাকি যে কলকাতার হাওয়া গায়ে না-লাগলে সত্যি কারো চোখ-কান খোলে না। (শুধু আমি নই, আমাদের দলে সকলের মুখেই ঐ কথা।) আর রুক্মি—হয়তো তার ম্যাণ্ডালের কনভেণ্টে লেখাপড়া কিছু শিখেছিলো সে, শান্তিনিকেতন-মার্কা 'বাঙালি কালচার'ও আয়ত্ত করেছে খানিকটা, কিন্তু কলকাতায় তো বাস করেনি

কখনো, তাই উনিশ বছর বয়সেও অনেকটা যেন ছেলেমানুষ থেকে গেছে। এই যেমন—প্রথম দেখা হওয়ামাত্র সে 'তুমি' বলেছিলো আমাকে, আমি অবাক হয়েছিলাম। আমাদের বাড়ির কুকুরটাকে দেখে জিগেস করলো, 'ও টেরিয়ার নাকি?' আমি জবাব দিলাম, 'ক্যালকাটা টেরিয়ার।' 'ক্যালকাটা টেরিয়ার? ও-রকম একটা জাত আছে জানতাম না তো।' 'মানে হ'লো, খাঁটি দিশি কুকুর—আমার বৌদি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন।' 'তা হোক, বেশ সুন্দর।'—আমার রসিকতাটা মাঠে মারা গেলো।

আর, ঐ যাকে বললাম স্নায়ুর কাঁপুনি, সেটা যেন ওর কাছে কিছুই নয়—মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায়, কলকাতার চোদ্দ বছরের মেয়েও যতটা রঙ্গভঙ্গ দেখাতে পারে, যতটা জানে নিজেকে লুকোতে এবং বাঁকাতে এবং জাহির করতে, সে-সবের কিছুই ওর মধ্যে নেই। বড্ড বেশি 'ভালো মেয়ে'—পানসে, অথচ তাকে খুকি-ধরনের অবোধ জীব ভেবে উড়িয়ে দিতেও আমি পারি না—হঠাৎ-হঠাৎ সে কেমন একটা চমকানিও যেন ছিটিয়ে দেয়। যেদিন ধরা যাক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল নিয়ে কথা হচ্ছিলো—'আমি আর বাবা যাচ্ছি কাল, তুমি আসবে?' আমি উদাসীন নিশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'নাঃ, আমি আর গিয়ে কী করবো।' 'নিশ্চয়ই তুমি আগে দেখেছো, কিন্তু আর-একবার দেখলে ক্ষতি কী?' সত্যি বলতে আমি ঐ নকল-তাজমহলের আশে-পাশে অনেক ঘুরেছি, কিন্তু ভেতরে যাইনি কখনো; সে-কথাটা চেপে গিয়ে জবাব দিলাম, 'ওটা তো জোড়ে-জোড়ে ঘুরে বেড়াবার জায়গা, সে-সব মেলা-খেলা ছাড়া আর-কিছু দেখার আছে নাকি?' বলতে-বলতে চোখের একটু ভঙ্গি করলাম আমি, কিন্তু রুক্মি যেন তা লক্ষ্যই করলো না। ঠোঁটের কোণে হেসে আস্তে বললো, 'ভেতরে অনেক

পুরোনো আমলের ছবি আছে না?'—এমনি আর-একদিন, তাকে ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজাতে দেখে আমি বললাম, 'উঃ, কী গন্ধ! আমার মাথা ধ'রে যাচ্ছে।' সে এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভারি কষ্ট তো তোমার। ফুলের গন্ধে অ্যালার্জি।' এ-রকম সময়ে আমার কেমন সন্দেহ হয় সে-ই বুঝি ঠাট্টা করছে আমাকে।

আবার, যখন দেখি এই ভিড়ের বাড়িতে সে একমনে ব'সে বই পড়ছে বা তেতলায় তার কোণের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে জানলার ধারে চুপচাপ, আমি না-ডাকা পর্যন্ত টের পাচ্ছে না কেউ এসেছে—তখন আমার তাকে মনে হয় দেমাকি, মনে হয় সে নিজেকে তার আশে-পাশের লোকেদের চাইতে 'উঁচু জাতের' মানুষ ব'লে ভাবে—শুধু ঐ দাঁড়াবার ভঙ্গিটা, বইয়ের ওপর ঝুঁকে-পড়া তার মুখের ভাব, তা-ই যেন তাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সরিয়ে দিচ্ছে, অথচ কথাবার্তা শুরু হ'লে আবার তার বালিকা-ভাব বেরিয়ে পড়ে, কোনো তর্ক উঠলে সহজেই হার মেনে নেয়। আমার ইচ্ছে করে তাকে খোঁচা দিয়ে কিছু বলতে, অন্যেরা যে ফ্যালনা কিছু নয় আর তারও মধ্যে যে গলতি আছে তা প্রমাণ করতে;—আমি তাকে আমার ছাপা-হওয়া লেখাগুলো এনে দেখাই, আমি লিখি শুনে সে এমন ভাবে তাকায় যেন সেটা কী-না-কী ব্যাপার (বেচারা—জানে না তো কলকাতায় লিখনেওলাদের ব্যাটালিয়ন অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে!) কিন্তু তারপর যখন লাইন ধ'রে-ধ'রে অর্থ খোঁজে, হেসে না-ফেলে পারি না। কোথায় যেন 'প্রাচ্যের সভ্যতা' লিখেছিলাম, সে বললো, "প্রাচ্যের" কেন? "প্রাচ্য" লিখলেই হ'তো না?' ভুলটা বুঝতে পেরেও আমি গম্ভীর মুখে বললাম, 'ওটাও হয়।' 'হয় নাকি? জানতাম না।' তার এই প্রতিবাদহীন বিনীত ভাবটা আমার বরদাস্ত হয় না—আমি চেষ্টা করি তার সঙ্গে তর্ক বাধাতে, তার বাংলা

বলাতে ভুল ধ'রে তাকে উস্কে দিই। হয়তো বললো, 'বাবার ঐ এক দোষ—একেবারে বিশ্রাম নেন না।'—আমি তক্ষুনি টিপ্পনি কাটি, '"বিশ্রাম নেন না"—এ আবার কী-রকম বাংলা হ'লো?' 'ভুল?' 'ইংরিজি থেকে তর্জমা-করা। আর তোমার "চা তৈরি হচ্ছে," "জামা-কাপড় বদলানো"—ওগুলিও তা-ই।' 'কী হবে?' 'কলকাতায় থাকো কিছুদিন, ট্রামে-বাস্-এ ঘুরে বেড়াও—তাহ'লেই শিখবে।' 'কিন্তু কলকাতার লোকেরা এত ইংরিজি মিশিয়ে বাংলা বলে কেন? সেদিন একজনের মুখে শুনলাম, "আমি একটা আর্জেন্ট কাজে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু বাস্-এ ব্রেকডাউন হ'লো।" অদ্ভুত।' 'অদ্ভুত কিছু নয়, ও-রকমই বলে সবাই।' 'তা-ই তো দেখছি। তুমিও বলো—অমুকটা বড্ড "বোরিং"। তমুকটা "ইন্টরেস্টিং" নয়।' আমার বেশ রাগ হ'লো তার কথায়, তার মুখে ইংরিজি কথাগুলো কেমন বাঁকা আর অস্বাভাবিক শোনালো, জোর গলায় বললাম, 'ওগুলোকে ইংরিজি বলাই ভুল—বাংলা হ'য়ে গেছে!' 'বাংলা হ'য়ে গেছে তো অভিধানে নেই কেন?' '"অভিধান" মানে—ডিক্‌শনারি? তুমি দেখছি বইয়ের ভাষায় কথা বলো!' আমি চুল দুলিয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম।

অন্য এক দিক থেকেও আমি তাকে আক্রমণ করি মাঝে-মাঝে। 'এত অমিশুক কেন তুমি?' 'তা-ই নাকি?' 'ঐ যে তোমার বোন-টোন সবাই—তোমারই বয়সী—তাদের সঙ্গে গল্প করো না কেন?' 'করি তো।' 'আমি দেখিনি।' 'তুমি এলে তোমার সঙ্গেই কথা বলি।' 'সেদিন লুডো খেলা হচ্ছিলো—তোমাকে ডাকলো ওরা, এলে না।' 'আমার ভালো লাগে না লুডো খেলতে।' 'না-হয় ওদের খুশি করার জন্যই বসতে।' 'বেশ, আর-একদিন খেলবো।' 'থাক, আর দয়া দেখাতে হবে না।' আমার কথায় একটা ঝাঁঝ ফুটলো, রুকৃমি যেন

অবাক হ'য়ে তাকালো আমার দিকে। একটু পরে নরম গলায় বললো, 'এ-কথাটা তুমি ভালো বললে না।'

ভালো-মন্দ জানি না, কিন্তু আমার ঐ ঝাঁঝের পেছনে একটা কারণ ছিলো। আমি মানুষটা উঁচকপালে নই, ট্রেনে যেতে-যেতে অচেনা কারো সঙ্গে গল্প জমাতেও আমার বাধে না, কামরায় কেউ তাস বের করেছে দেখলে নিজেই এগিয়ে যাই—এ-বাড়ির নায়রী-ঝিয়ারি মেয়েদের দিকে আমি একটুও নজর দেবো না, তা কি হ'তে পারে? নজরটা হয়তো তাদের দিক থেকেই বেশি ছিলো শুরুতে, হয়তো ও-সব নারীঘটিত ব্যাপারে তারা আমাকে কয়েক পা এগিয়েও দিয়েছিলো। গুটিপাঁচেক মফস্বলি নমুনা, বয়স মনে হয় ষোলো থেকে কুড়ি-একুশ, বিয়ের জন্য টইটুম্বুর তৈরি কিন্তু হ'য়ে উঠছে না, শিক্ষা যেটুকু পেয়েছে তার বেশির ভাগই সিনেমা আর রেডিও থেকে, আর অবশ্য নতুন-বিয়ে-হওয়া বন্ধুনিরা যা শিখিয়েছে। কারণে-অকারণে বুকের আঁচল টানছে তারা, খোঁপায় হাত দিচ্ছে, তাদের মুখে 'যাঃ!' আর 'ধ্যেৎ!' শব্দ বড্ড বার-বার শোনা যায়—আমার বেশ মজা লাগে তাদের দেখতে, মেলামেশা ক'রেও আরাম পাই না তা নয়। আমি লুডো নিয়ে ব'সে যাই ওদের সঙ্গে, আজব শহর কলকাতার গল্প শোনাই—চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে কথা গেলে ওরা, কোনো হাসির কথা হ'তে-না-হ'তেই কুটিপাটি হ'য়ে পরস্পরের গায়ে ঢ'লে পড়ে। নিশ্চয়ই ওরা সকলেই একরকম ছিলো না, কিন্তু আমার মনে হ'তো তা-ই, আর প্রায়ই দেখতাম ওরা দল বেঁধে ঘুরছে, অন্তত দু-তিনজন একসঙ্গে, যদি হঠাৎ কেউ একা আমার সামনে প'ড়ে যায়, আর আমি শুধু বলি, 'কেমন আছো?' তাহ'লে লাল-টাল হ'য়ে পালাবার যেন পথ পায় না। আমার প্রথম চুমু-টুমু খাওয়া এদেরই একজন বা দু-জনের সঙ্গে ঘটেছিলো।

কিন্তু তবু—ঐ মস্ত তেতলা বাড়িটার মধ্যে রুক্‌মি যে আছে কোথাও, হয়তো তার নিজের ঘরেই, বা তার মা-র সঙ্গে কেনাকাটায় বেরিয়ে থাকলেও আসবে এখনই, বা একতলায় তাদের রান্নাঘরের পেছনে যে-রোগা কুকুরটা ঘুরঘুর করে তাকে দুধ-রুটি খাওয়াচ্ছে হয়তো—যতক্ষণ ও-বাড়িতে থাকি আমি তা ভুলতে পারি না। আমি চাই ঐ লুডো-খেলুনি দলের মধ্যে সে-ও আসুক, তার মুখোমুখি হ'লেই আমার কেমন লজ্জা করে ঐ মেয়েদের সঙ্গে অত মেলামেশা করছি ব'লে (যদিও তা নিয়ে সে কখনো কিছু বলে না), আমার রাগ হয় নিজের ওপরে, তার ওপরেও। তারপর যখন মনে পড়ে রুক্‌মির শিগগিরই বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে, আর হয়তো কখনো তাকে দেখবো না, তখন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

রুক্‌মির বিয়ে কার সঙ্গে বা কী বৃত্তান্ত, তা নিয়ে আমার একফোঁটা কৌতূহল নেই, তবু কয়েকটা খবর ভেসে-ভেসে কানে এসেছে। ব্যারিস্টার পাত্র, নাম গগনবরন মুন্সি, থাকে পাটনায়, বাপ সেখানকার সরকারি উকিল, রাঁচি অঞ্চলে জমিজমাও আছে বিস্তর—মানে, যেমনটি আশা করা যায়, তেমনি। 'রোখের জামাই!' 'খুব বাগিয়েছে হরেন!' 'স্বভাবচরিত্র কেমন কে জানে'—বণ্ডেল রোডের আত্মীয়-মহলে এই ধরনের কথাবার্তা চলে, মহিলাদের ব্যবহারও নিয়মমাফিক। কোনো বৃদ্ধা তার থুৎনিতে হাত রেখে বলেন, 'ভাগ্যবতী!' আড়ে-ঠারে একটু রসিকতা করেন কেউ। কোনো বছর তিরিশের সন্তানবতী চোখ টিপে বলেন, 'কী রে? কেমন লাগছে?' এ-সব অবস্থায় রুক্‌মিকে দেখি শান্ত—লাল হ'য়ে উঠছে না, মুখ নিচু ক'রে নখ খুঁটছে না, সে যে লজ্জা পেয়েছে বা বিব্রত বোধ করছে এমন কোনো লক্ষণ নেই তার মধ্যে। আমি ধ'রে নিয়েছি সে চেষ্টা ক'রে লুকোচ্ছে নিজেকে—অত যে

নিরিবিলি সময় কাটায় তাও হয়তো তার বিয়ে অত কাছে ব'লেই, হয়তো জানলার ধারে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দ্যাখে তার নতুন জীবনের, বই খুলে ব'সে অন্য কথা ভাবে—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—মেয়েরা তো বিয়ের জন্যই জন্ম নেয় আর বড়ো হ'য়ে ওঠে, তাছাড়া আর আছে বা কী তাদের জীবনে।—কিন্তু একদিন আমার মনে হ'লো যে তার এই বিয়ে ব্যাপারটার অর্থ কী, রুক্মি তা ঠিকমতো ধারণা করতে পারছে না।

চেয়ারে ব'সে চিঠি পড়ছিলো সে, কোলের ওপর হরেক রঙের বিদেশী ডাকটিকিট লাগানো একটা এনভেলাপ, আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে বললো, 'একটু বসবে? চিঠিটা প'ড়ে নিই?' 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—সে আর একটা কথা কী।' সে চিঠি পড়ছে, আমি মাঝে-মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছি, বড়ো-বড়ো কাগজে এপিঠ-ওপিঠ চার পৃষ্ঠা জোড়া চিঠি—তার ঠোঁটে হাসি ফুটছে কখনো, কখনো চোখ দুটি মনোযোগের চাপে একটু ছোটো দেখাচ্ছে। ওটা শেষ ক'রে ছোটো কাগজে লেখা আর-একটা চিঠি পড়লো—আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম তাতে হাতের লেখা আলাদা। আমার হাতে কয়েকটা স্ন্যাপশট দিয়ে বললো, 'দেখবে নাকি?' আমি আলগোছে তাকিয়ে বললাম, 'কে এরা?' 'আমার দাদা, আর তার এক বন্ধু।' রুক্মির দাদার কথা ঝাপসাভাবে শুনেছিলাম—এ রকম একটা আনন্দের সময় ছেলে প'ড়ে রইলো বিদেশে, এই একটাই দুঃখ র'য়ে গেলো হরেন-মৃণালিনীর। বললাম, 'নিশ্চয়ই ঐ লম্বাজন তোমার দাদা—রেনকোট কাঁধে?'' ঠিক ধরেছো।' 'আর অন্যজন?' 'বললাম যে—দাদার এক বন্ধু—সেও এখন ন্যুয়র্কে। ওঁরা একটা হ্রদের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ছবিতে হ্রদটা আসেনি।' আমি আর-এক পলক তাকিয়ে বললাম, 'দুই বন্ধুতে চেহারায় কিন্তু একটুও মিল নেই। তোমার দাদা যেমন

লম্বা-চওড়া, বন্ধুটি তেমনি রোগা আর ছোটোখাটো। মজার দেখতে।' 'আমি এতে মজার কিছু দেখতে পাই না,' তক্ষুনি জবাব দিলো রুক্মি। 'আসল কথা হ'লো মনের মিল—চেহারায় কী এসে যায়।' 'তাই তো। তোমার দাদা বিয়েতে আসছেন না শুনলাম?' 'পারছে না আসতে। ছুটি নেই।' 'তোমার দাদা চাকরি করছে ওখানে?' 'খানিকটা চাকরি, আরো বেশি গবেষণা। ওঁরা দুজনেই তা-ই। দাদা কাজ করছে ক্যানসার নিয়ে, আর অবন্তী হ'লো দার্শনিক—সে নাকি এমন এক জটিল তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে যা বোঝার মতো লোক পৃথিবীতে একশোজনের বেশি নেই।' হালকা গলায় হাসলো রুক্মি, তারপর চিঠিটা খামে ভ'রে রাখতে-রাখতে আবার বললো, 'দাদা চেয়েছিলো আমিও আমেরিকায় গিয়ে কিছু পড়াশুনো করি, এই বিয়েতে খুব খুশি হয়নি বোধহয়।'

রুক্মির দাদার বিষয়ে এবারে একটু উৎসাহিত হলাম আমি, পিঠ খাড়া ক'রে বললাম, 'সত্যি তা-ই?' 'তা-ই তো মনে হয় তার চিঠিপত্র থেকে।' আমি জিগেস করলাম, 'তোমার নিজের কিছু মনে হয় না?' 'আমার মনে হয় এই ভালো হচ্ছে।' তার মুখের দিকে তাকালাম আমি, নিজের বিয়ে নিয়ে এত সহজ সুরে তাকে কথা বলতে শুনে আমার অবাক লাগলো। 'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই ভালো, ও-রকম সুপাত্র নাকি হয় না।' আমার কথাটায় একটু বাঁকা সুর ছিলো, হয়তো সেই তিরিশ বছরের সন্তানবতীরই মতো আমি জানতে চাচ্ছিলাম রুক্‌মির ঠিক 'কেমন লাগছে'—কিন্তু উত্তরে সে শুধু বললো, 'আমিও তা-ই শুনেছি।' 'গগনবাবুকে তুমি দ্যাখোনি কখনো?' 'দেখেছি—রোংটুতে এসেছিলেন একবার দু-দিনের জন্য।' 'নিশ্চয়ই তোমার ভালো লেগেছে খুব?' 'সুন্দর চেহারা।' 'আর?' 'বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন চা-বাগানের

শেয়ার-টেয়ার নিয়ে। কত যে খবর রাখেন, আইনকানুন জানেন—আশ্চর্য।' 'তোমাকে কিছু বললেন না?' 'মা-র আর আমার জন্য শাড়ি এনেছিলেন, দিয়ে গেলেন যাবার সময়। আর আমাকে একটা আংটি—এই যে,' রুক্মি তার আঙুল বাড়িয়ে দেখালো আমাকে। 'তার মানে—তোমার সঙ্গে ঠিক চেনাশোনা হয়নি?' 'সে-সব আস্তে-আস্তে হবে।' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'এই ধরনের পাতানো বিয়েতে তোমার আপত্তি হ'লো না?' 'আপত্তি কেন হবে—জন্ম থেকে মা-বাবাকে তো দেখে আসছি, তাঁদেরও পাতানো বিয়ে হয়েছিলো।' 'তোমার মা-বাবা কতকাল আগেকার, তুমি কেন তাঁদেরই মতো হ'তে যাবে?' 'আমি তো চেষ্টা ক'রে কিছু হচ্ছি না, আমি এই রকমই।' হাসলো রুক্মি, আমি বুঝলাম এ নিয়ে আর কথা ব'লে লাভ নেই। কেন জানি না, রুক্মির দাদার আর তার বন্ধুর কথা আমি একটু ভেবে ফেললাম এর মধ্যে—একদিকে এই বিদ্বান ব্যক্তিরা, অন্যদিকে ব্যারিস্টার গগনবরন, যেদিক থেকেই দেখা যাক না, বড্ড দূর আমার জীবন থেকে রুক্মি, আমার গড়িয়াহাটের মোড় থেকে, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আড্ডা থেকে, আমার আধো-বেকার দায়িত্বহীন খেয়াল-খুশিভরা জীবন থেকে বড্ড বেশি দূর।

একটা কথা জানার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছিলো, অথচ সোজা-সুজি জিগেস করাটা ভদ্রতা হবে না, আমি তাই কৌশল ক'রে বললাম, 'তোমার দাদা খুব লম্বা-লম্বা চিঠি লেখেন দেখছি?' 'না—দাদা চিঠি লেখায় বেশি পটু নন, ঐ লম্বা চিঠিটা অবন্তীর।' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। 'অত বড়ো চিঠি!' 'আর বোলো না। সব গুরুগম্ভীর জ্ঞানের বিষয়—সে যা নিয়ে গবেষণা করছে তারই সাতকাহন কথা—আমি ও-সবের কী বুঝি বলো তো!' ব'লে নিচু গলায় হাসলো রুক্মি।

'তুমি পড়তে চাও ও-চিঠি? প'ড়ে বুঝিয়ে দেবে আমাকে?' আমি দু-হাত তুলে ব'লে উঠলাম—'ওরেব্‌বাবা, রক্ষে করো!' এর পর দু-তিন মিনিট চুপচাপ কাটলো।

সন্ধে হ'য়ে আসছে তখন, বিয়ের আর দিন সাতেক মাত্র বাকি। কোনো-এক কারণে বাড়িটাও চুপচাপ ছিলো মনে পড়ে, অন্তত তেতলায় কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া কেউ বাড়ি ছিলো না বোধহয়, হরেন-মৃণালিনী শেষ দফার সওদাপত্র নিয়ে ব্যস্ত, অন্যেরা গেছে আত্মীয়-বাড়ি বা সিনেমায় বা কলকাতার অন্য কোনো আমোদ-প্রমোদে—কেমন থমথমে চুপচাপ যেন চারদিক, ঘরের আলো ঝাপসা, আমি ভাবছি এবার উঠে পড়লে হয়, হঠাৎ রুক্‌মির গলা পেলাম—'ঐ দ্যাখো, মেঘ!' তাকিয়ে বললাম, 'এক্ষুনি ঝড় উঠবে—জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিই?' 'না—না, খোলা থাক—আচ্ছা, ওদিকের দুটো বন্ধ করো, কিন্তু এইটে না—' বলতে-বলতে সে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো, আমাকে হাত নেড়ে ডাকলো, 'এসো—ঝড় দেখবে এসো!' আমি সাবধানে একটু দূরে দাঁড়িয়েছি, দেখছি রুক্‌মির চুল লালচে হ'য়ে যাচ্ছে ধুলোয়, সে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা ধরছে, ইচ্ছে ক'রে গা ভিজোচ্ছে মনে হয়—যতক্ষণ কালবোশেখির ঘটাপটা চললো, একবার জানলা থেকে নড়লো না। নিশ্চয়ই তার আনন্দ হচ্ছে খুব, কিন্তু আমি তাতে অংশ নিতে ঠিক পারছি না—ধুলো গিলতে ভালো লাগে না আমার, আর ততক্ষণে আমার মনে প'ড়ে গেছে সুখময় গড়িয়াহাটের মোড়ে সাতটা নাগাদ দাঁড়িয়ে থাকবে আমার জন্য, এদিকে আমি বৃষ্টির জন্য এখানে আটকে গেলাম।

সেই কয়েকটি স্তব্ধতার মুহূর্ত, কলকাতার হাজার ছাদের ওপর দিয়ে

ছুটে-আসা কালো-কালো মেঘ—কালো, নীল, ধোঁয়াটে—বৃষ্টির শব্দ, ভেজা মাটির গন্ধ, আলো-না-জ্বলা ঘরের জানলায় রুক্মির পিঠ-বাঁকানো ঝাপসা চেহারাটা—আর তার আগে যে-ফোটোগ্রাফটা আমাকে দেখিয়েছিলো রুক্মি, তখনকার কথাবার্তা—এই সবই আমার মনে পড়েছিলো—বহুকাল পরে—রুক্মির সঙ্গে আবার যখন দেখা হ'লো তখন নয়, দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরে যাবার পর, এক মেঘলা দিনে কাপ্রি কাফেতে ঢুকতে গিয়ে, হঠাৎ আমাকে যেন অবাক ক'রে দিয়েছিলো—আমি জানতাম না এত আমার মনে আছে।

কিন্তু এ-রকম ঘটনা আগেও একবার ঘটেছিলো আমার।

৬

রুক্মির যেদিন বিয়ে সেদিন সকালেই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তেতলায় তার মায়ের ঘরে ব'সে ছিলো রুক্মি, খাটের বাজুতে অল্প একটু হেলান দিয়ে। পরনে হালকা-নীল ডোরা-কাটা শাড়ি, পিঠের ওপর চুল ছড়ানো, গায়ে-হলুদের কাঁচা রংটা এখনো হাতে গলায় লেগে আছে। আমি তার কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সুন্দর দেখাচ্ছে।'

সে চোখ তুলে বললো, 'বোসো, ধীরাজ-দা। এখানে বোসো।' নিজে সোজা হ'য়ে ব'সে তার পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলো।

মৃণালিনী এলেন তিনখানা বেনারসি হাতে নিয়ে—একটা টুকটুকে লাল, একটা গোলাপি, আর একটা ম্যাজেন্টা রঙের—'রুক্মি, দ্যাখ, কোনটা তোর পছন্দ। বিয়ের শাড়িটা আলাদা ক'রে রাখবো।'

'যেটা হয়।'

'লালটা বড্ড চড়া মনে হয়—গোলাপিটায় আবার বুটি তেমন খোলেনি। ম্যাজেণ্টাই ভালো হবে।'

'তাহ'লে তা-ই।'

আমি হেসে বললাম, 'অত ভাবছেন কেন, মাসিমা? রুক্‌মিকে যে-কোনো রঙেই মানাবে।' আমার মন-মেজাজ খুব ভালো ছিলো সেদিন, বিকেলের ট্রেনে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঘাটশিলায় বেড়াতে যাচ্ছি।

দরজার কাছে হরেনবাবুকে দেখা গেলো। 'এই যে ধীরাজ এসে গেছো। আছো তো আজ সারাদিন? মৃণাল একবার এদিকে এসো, ড্রেসিংটেবিলের আয়না নিয়ে এসেছে।'

রুক্‌মির পাশে একা ব'সে, আমাকে কিছু কথা বানাতে হ'লো। 'তোমাকে আজ শেষরাত্রে উঠতে হ'লো তো?' 'আমার ভোরে উঠে অভ্যেস আছে।' 'উপোস করছো?' 'চা খেয়েছিলাম।' 'আর-কিছু খাবে না সারাদিনে?' 'দেখা যাক—খুব খিদে পায় যদি।' 'উঃ—কী কষ্ট এই হিন্দু বিয়ে ব্যাপারটা!' 'তা আমরা থাচ্ছি তো রোজই—একদিন না-খেয়ে দেখলে হয় কেমন লাগে।' 'আসলে তুমি খুব নিয়ম-টিয়ম মেনে চলছো—তা-ই না?' আমি হাসলাম, রুক্‌মির ঠোঁটের কোণেও হাসি ফুটলো। 'আমাদের স্কুলের মাদার ম্যাডলীন বলতেন—নিয়মটাকেই ইচ্ছে ক'রে নিতে পারলে তার মতো সুখ আর নেই।' 'বাজে কথা! আমি একেবারেই মানি না। সাড়ে-দশটা থেকে সাড়ে-চারটে পর্যন্ত ইস্কুল-পড়ানোর মতো বিভীষিকা আর আছে নাকি পৃথিবীতে!' রুক্‌মি প্রতিবাদ করলো না, একটু পরে বললো, 'মাঝে দু-দিন আসোনি কেন?' এ-প্রশ্নটা তার মুখে আশা করিনি, কেননা

এ-বাড়িতে যাওয়া-আসার কোনো বাঁধা সময় আমার কখনোই ছিলো না। আবছা জবাব দিলাম, 'আসিনি—নানা কাজ ছিলো।' 'স্কুল তো ছুটি হ'য়ে গেছে ?' 'স্কুল ছাড়া কি কাজ থাকতে নেই ?' 'কিছু লিখছো ?' 'নাঃ। মানে—' কথাটা আমার মনের ধারে-কাছেও ছিলো না, কিন্তু কেন জানি না ব'লে ফেললাম হঠাৎ—'মানে, একটা উপন্যাস লেখার কথা ভাবছি, কিন্তু আমার বই তো ছাপবে না কেউ।' 'ছাপার কথা পরে, আগে লেখো তো। তোমাদের "শতাব্দী" আবার কবে বেরোচ্ছে ?' 'ঠিক নেই কিছু।' 'বেরোলে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। চাঁদা দিয়ে যাবো ?' 'না—না—তোমাকে কেন চাঁদা দিতে হবে ?' 'দিয়েই যাই—' সে উঠে গিয়ে একটা দশ টাকার নোট এনে দিলো আমাকে। 'এত দিয়ে কী হবে ? চাঁদা তো মোটে তিন টাকা।'' ঠিক আছে—পরে ফেরৎ দিয়ো।'

আমি আড়চোখে হাতঘড়ি দেখলাম। প্রায় দশটা, কথা আছে একটা নাগাদ চুং-ওয়াতে জড়ো হবো আমরা, সেখানে ঠাণ্ডা বিয়ারের সঙ্গে চৌ-মীন খেয়ে নিয়ে সোজা চ'লে যাবো হাওড়া স্টেশনে। তার আগে একবার বাড়ি যেতে হবে আমাকে, স্নান বাকি, দু-একটা জামা-কাপড়ও সঙ্গে নেয়া দরকার। তা হোক, সময় আছে এখনো, আরো কিছুক্ষণ বসা যায়।

একটি দাসী চা আর মিষ্টি এনে রাখলো আমার সামনে, চায়ে চুমুক দিয়ে আমি আবার কিছু বলার কথা খুঁজে পেলাম।

'পাটনা কেমন জায়গা ?' 'দেখিনি এখনো ?' 'গগনবাবুদের—মানে তোমাদের বাড়িটা নাকি গঙ্গার ধারে ?' 'ঠিক ধারে নয় বোধহয়, দেখা যায় শুনেছি। 'কবে যাচ্ছো ?' 'পাটনা যাচ্ছি দিন দশেক পরে।' 'তারপর ?' 'তারপর···' একটু থেমে বললো, 'শোনো—আমি পুজোর

সময় মা-র কাছে যাবো, থাকবো মাসখানেক। তুমি আসবে একবার?' আমার মুখে রসগোল্লা ছিলো, সেটা গিলে নিয়ে বললাম, 'রোংটুতে? তা গেলে হয়, চায়ের বাগান দিখিনি কখনো! খুব নির্জন জায়গা?' 'ঐ আরকি—লোকজন সবই চায়ের বাগানের। তবে পাহাড়গুলো খুব সবুজ, বেড়াবার জায়গা দু-একটা আছে মন্দ না। আর আমরা আছি।' 'কী ক'রে যেতে হয়?' 'কার্সিয়ং থেকে মাইল চব্বিশ রাস্তা। আগে জানিয়ো, বাবা গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।' 'খুব চেষ্টা করবো। বলো তো একবার পাটনাতেও ঘুরে আসতে পারি।' চা শেষ ক'রে আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'এখন চলি তা'হলে?'

'এখনই যাবে?' রুক্‌মিও উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ দেখি, তার চোখ জলে ভ'রে উঠেছে। বিয়ের দিনে মেয়েদের এই কান্না—মুশকিল!

আমি ফুর্তির সুরে বললাম, 'ব্যাপার কী? কান্নার কী হ'লো?'

কয়েকটি জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো আস্তে-আস্তে, তার গালের ওপর নীল শিরাটি স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। চুপ ক'রে রইলো একটুক্ষণ, তারপর হালকা হাসির মতো গলায় বললো, 'এই কথা রইলো তাহ'লে। ভুলো না কিন্তু।'

'রুক্‌মি, তোর শ্যামপুকুরের পিসিমা এসেছেন,' বলতে-বলতে মৃণালিনী ঘরে এলেন—'বাতের জন্য সিঁড়ি ভাঙতে তাঁর কষ্ট হয়, তুই নিচে চল একবার। ধীরাজ এখনই উঠছো যে বড়ো? ও-বেলা খুব শিগগিরই চ'লে এসো—মা-কে নিয়ে এসো একেবারে—কেমন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—' আমি আর পেছন ফিরে তাকালাম না, আজ বিকেলেই কলকাতার বাইরে যাচ্ছি এ-কথা মুখ ফুটে বলতে আমার বাধলো। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুঃখিত হবেন, কে জানে রুক্‌মিও কিছু মনে করবে হয়তো। ফিরে এসে যা হোক কিছু বলা যাবে।

এর ঠিক তিন বছর পরে, তেমনি এক গ্রীষ্মের সকালে, আমি আমার প্রথম উপন্যাসের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছিলাম। আমার বেশ একটু ভোগান্তি হয়েছিলো ওটা নিয়ে। আগে যে-রকম সাংকেতিক গোছের ছোটো-ছোটো গল্প লিখতাম, কোনো কুড়িহাজার-কাটতির পূজা-সংখ্যায় তা চলবে না, সেখানকার জন্য বাস্তব চাই, সকলের বেশ চেনা-চেনা লাগে এমন কতগুলো মানুষ চাই—মেয়ে, পুরুষ দুই জাতেরই। তার ওপর অতগুলো পৃষ্ঠা, অতগুলো ঘণ্টা ধ'রে কলম চালানো—আমি পেরে উঠবো কি? টাকার জন্য রাজি হ'য়ে গিয়েছি, লিখতেই হবে, কিন্তু মগজটা একদম ফাঁকা। কী ক'রে শুরু করি?

এ-রকম সময়ে আমার মনে প'ড়ে গেলো রুক্মিকে, তার বিয়ের দিনের সকালবেলাটা যেন ঝুম ক'রে আকাশ থেকে পড়লো। মনে হ'লো ওটা দিয়ে আরম্ভ করলে মন্দ হবে না। অনেক বাজে খুঁটিনাটিও মনে পড়লো অবশ্য 'শতাব্দী'র চাঁদা (যদিও পত্রিকা পাঠানো হয়নি), রুক্মির পাটনা থেকে লেখা চিঠি, যার জবাব দেবার দরকার আছে ব'লে ভাবিনি, আর সেই রোংটুতে যাওয়ার কথা।— তা ও-রকম কতই বলে লোকেরা, সব কি আর হ'য়ে ওঠে। এগুলো উপন্যাসে কোনো কাজে লাগবে না, একটু ভিন্নভাবে সাজাতে হবে। যেন চোখ বুজে শুরু ক'রে দিলাম সেদিন, তারপর কেমন ক'রে এগিয়ে গেলো নিজেই বুঝলাম না।

'খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে ব'সে আছে বিকাশ, তার পাশে অঞ্জনা। অঞ্জনার পরনে একটি হালকা রঙের ডোরা-কাটা শাড়ি, রুখু চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। আজ শেষরাত্রে তার গায়ে-হলুদ হ'য়ে

গেছে, এখন বেলা সাড়ে-নয়, জ্যৈষ্ঠের দিন তেতে উঠছে।'—এমনি ক'রে, যদ্দুর মনে পড়ে, শুরু হয়েছিলো 'ঢেউয়ের পর ঢেউ', আমার প্রথম উপন্যাস, লেখার সময়ে যার ফলাফল আমার কল্পনার ত্রিসীমানায় ছিলো না। আমার অঞ্জনা বিকাশের হাতের ওপর হাত রেখেছিলো, তার 'সরু-সরু শাদা' আঙুলগুলো নড়ছিলো না, তার চোখ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিলো দু-গাল বেয়ে, আর বিকাশ জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিলো। কী যেন কিছু শাদামাটা সংলাপ ছিলো এর পরে, অঞ্জনার চোখের জল থেমে গিয়েছিলো, 'ভেজা চোখে এক ঝিলিক হাসি ফুটিয়ে' বলেছিলো, 'বিকাশ-দা, তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো?'

আমার গল্পটার বাঁকে-বাঁকে অনেক বদলে গিয়েছিলো অঞ্জনা, আমি তাকে দিয়ে এমন অনেক খেলা খেলিয়েছিলাম যাতে রীতিমতো চমক লেগেছিলো পাঠকদের, যদিও ফিল্ম থেকে তার অনেকটাই বাদ পড়েছিলো, যেহেতু ডিরেক্টর নিমাই ভঞ্জের মতে 'পাব্লিক অতটা নেবে না।' কিন্তু আরম্ভটুকু ঠিক বইয়েরই মতো রেখেছিলেন তিনি ('বিয়ে দিয়ে শেষ না-ক'রে আরম্ভ—এটা বেশ নতুন ভেবেছেন, ধীরাজবাবু!'), বইয়ের ওপরেও এক পল্লা রং চাপিয়েছিলেন। শুরুতে গায়ে-হলুদের কয়েকটা দ্রুত ও ঝাপসা শট দেখিয়ে তিনি উজ্জ্বল আলোয় ঐ দু-জনকে উদ্ভাসিত করেছিলেন—প্রথমে পুরো ঘরটা, আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি তাদের, আস্তে-আস্তে তারা কাছে এলো ও বড়ো হ'লো, তারপর শুধু খাটের ওপর আটকে রইলো ক্যামেরা, আমরা দেখলাম দু-তিন মিনিট ধ'রে নানা দিক থেকে মেয়েটিকে (বেশির ভাগ তাকেই, কেননা বিকাশ লোকটা বেশি কিছু নয়, ফিল্মটাকে অঞ্জনাই ধ'রে রাখবে)—কালো নাইলনে তৈরি তার গাল-ছোঁয়া পিছিগুলো, বিকাশের হাতের ওপর চুপ ক'রে প'ড়ে-থাকা তার পাঁচটি আঙুল যা

ক্যামেরার কায়দায় সরু-সরু আর লম্বা দেখাচ্ছে, তার পিঠের ওপর একঢাল চুল যা ফরমাশ দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন নিমাইবাবু, দেখলাম তার আধো-বোজা চোখের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে-পড়া প্রতিটি সুন্দর গ্লিসারিন-অশ্রু, এমনকি তার শাড়ির ওপর জলের মতো ডোরা-কাটা-কাটা দাগ—তা পর্যন্ত। আর তারপর সেই কথাটা—'তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো?' নিমাইবাবু তালিম দিয়ে-দিয়ে এমনভাবে সেটা বলিয়েছিলেন, এমন ঈষৎ-ভাঙা অস্ফুট গলায়, ভেজা চোখে হঠাৎ ফুটে-ওঠা একফোঁটা হাসির মধ্য দিয়ে, ঠোঁটের কোণে এমন একটি করুণ-করুণ ভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে, যে সেই মুহূর্ত থেকেই অঞ্জনা হ'য়ে উঠলো ফিল্মের লোকেরা যাকে ব'লে থাকে 'সিম্প্যাথেটিক'—অর্থাৎ এর পর সে যা-কিছু বলছে যা-কিছু করছে, তা-ই ভালো লাগছে সকলের। শুধু ঐ দৃশ্যটুকুর জন্য, অঞ্জনার মুখে ঐ কথাটুকু আরো একবার শোনার জন্য অনেকে নাকি চার-পাঁচবারও দেখতে গিয়েছে ছবিটা। কিন্তু ততদিনে নিমাইবাবুর 'পাব্লিক' অঞ্জনা নামটা ভুলে গেছে; লোকেরা যাচ্ছে সংহিতাকে দেখতে, সংহিতার 'কান্না-ভেজা হাসি'র কথা সকলের মুখে, শুধু চোখের ফোটো দেখে নাম ব'লে দেবার এক প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি শনাক্ত হয়েছে সংহিতা মালাকার। সংহিতা মালাকার, এই সেদিনও ফিল্মের পোকারা ছাড়া আর-কেউ যার নাম জানতো না, সে এক দমকে পুরোদস্তুর স্টার হ'য়ে উঠেছে, আমারও কপাল খুলে গেছে সেই সঙ্গে।

—এই আমি করেছিলাম রুক্মিকে নিয়ে, তার বিয়ের পরে প্রথম যখন তার কথা ভেবেছিলাম। লেখা ব্যাপারটাই অশ্লীল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

'আরে, রুক্মি! কী খবর? কেমন আছো?' 'তুমি কেমন আছো?' 'এই তো দেখছো।' হাসলাম আমি, মীটিঙের পরে হাততালির শব্দটা তখনও আমার কানে লেগে আছে, আমি যে বেশ বহাল-তবিয়তে আছি তা মুখে ফুটে না-বললেও চলে। 'চলো আমার ঘরে গিয়ে বসবে এক মিনিট। এই যে সিঁড়ি। আমি আগে গিয়ে দরজা খুলছি।' বেতের চেয়ারটায় বসতে দিলাম তাকে (আমার ঘরে সেটাই সবচেয়ে আরামের আসন), সে আমার মা দাদা-বৌদির খবর নিলো। 'তুমি তো পাটনাতেই?' 'মোটামুটি।' 'মোটামুটি মানে?' 'বছরে দু-বার দার্জিলিঙে আসি, বাবা একটা বাড়ি করেছেন এখানে।' 'তা-ই নাকি? জানতাম না।' ব'লেই মনে পড়লো চৌধুরী-পরিবারের কোনো সাম্প্রতিক খবরই আমি জানি না, মা-কে জিগেস করার

কথাও মনে হয়নি কখনো—দার্জিলিঙে আসার আগে বা পরে এও মনে পড়েনি যে হরেন চৌধুরী রোংটু ভ্যালি চা-বাগানের ডাক্তার। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, 'দেখলে তো, তুমি যে বলেছিলে একবার রোংটুতে আসতে—তোমার টানে কেমন দার্জিলিঙে চ'লে এলাম!' 'এই প্রথম এলে দার্জিলিঙে?' 'এই প্রথম।' 'কেমন লাগছে?' 'ভালোই।' 'মানে খুব ভালো না?' সত্যি বলতে তা-ই, একা কলকাতার বাইরে আসা আমার এ-ই প্রথম, এবারেও দু-জন বন্ধুর সঙ্গে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আটকে গেলো দু-জনেই, গোবিন্দবাবুর আপ্যায়ন সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে আড্ডার অভাবে হাঁপিয়ে উঠছি। 'ঐ আরকি—কলকাতার বাইরে আমার মন টেকে না বেশিদিন। তোমরা কখনো যাও না কলকাতায়?' 'তা যাই বইকি—ওঁর মামলা-সংক্রান্ত কাজ পড়ে মাঝে-মাঝে, কিন্তু দু-চারদিনের বেশি থাকা হয় না।' টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, নিচু হ'য়ে দেরাজ থেকে একটি চ্যাপ্টা বোতল বের ক'রে বললাম, 'তোমার কি কোনো আপত্তি হবে আমি একটু রাম্ খাই যদি?' এক পলক তাকিয়ে বললো, 'ওতে আর আপত্তির কী আছে।' 'তুমি?' 'আমার ও-সব অভ্যেস নেই।' 'গগনবাবুর নিশ্চয়ই শেরি-শ্যাম্পেন চলে—ব্যারিস্টার-মানুষ!' লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, 'তা, পাটনায় তুমি কী করো সারাদিন?'

দরজায় টোকা পড়লো, কয়েক ইঞ্চি কপাট ফাঁক ক'রে গোবিন্দবাবু তাঁর টেকো মাথাটি আর মাথার তলায় হাসি-মাখা মুখখানা বাড়িয়ে দিলেন। 'আসতে পারি? আরো কয়েকটা অটোগ্রাফ-খাতা, ধীরাজবাবু, আপনার জ্বালাতন, কিন্তু কী আর করবেন, নামজাদা হ'লে এ-সব ভোগান্তি আছেই। এই যে, রুক্‌মিণী—' রুক্‌মি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি বসুন, কাকাবাবু।' 'না, না, আমার সময় নেই,

অনেক কাজ প'ড়ে আছে ওদিকে। তোমার সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ ছিলো বুঝি ধীরাজবাবুর ?···বাঃ! পুরোনো লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়া—এর মতো আনন্দের আর কী আছে। যখন ভাবি কত লোকের সঙ্গে চেনাশোনা ছিলো এককালে, এখন তারা কে কোথায় জানি না, তখন, জানো···মনের মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে, জানো, মনে হয় জীবনটা যেন কিছুই না, ঐ বলে না পদ্মপত্রে জল, ঠিক তা-ই।' যেন নিজের কথায় লজ্জা পেয়ে নাকের ফাঁক দিয়ে হাসলেন গোবিন্দবাবু, চোরা চোখে আমার দিকে তাকালেন, আমি কাশলাম। রুক্‌মি তাড়াতাড়ি বললো, 'আমাদের ওখানে একদিন আসবেন, কাকাবাবু।' 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, গগনবাবুও এসেছেন শুনলাম, তোমার মা-বাবা ভালো আছেন তো ? আমি চলি এখন···চা পাঠিয়ে দেবো এখানে ? ও, না, ধীরাজবাবু তো অন্য জিনিশ খাচ্ছেন, তাহ'লে রুক্‌মিণীর জন্য—' 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি উঠবো এক্ষুনি।' 'একটু চা খাবে না তা কী ক'রে হয়, বোসো আর পাঁচ মিনিট···তা রুক্‌মিণী, কেমন দেখছো এই ঘরটা ? সাহিত্যিকের যোগ্য হয়েছে কিনা বলো! পর্দা-টর্দা সব নতুন, লেখার টেবিলও পেতে দিয়েছি, টেব্‌ল-ল্যাম্প দিয়েছি—যদি এই হোটেলে ব'সে কিছু লেখা হ'য়ে যায় হেঁ-হেঁ, আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয় তো···' গোবিন্দবাবু আর-একবার তাকালেন আমার দিকে, আমি কোনো মন্তব্য করলাম না। তিনি চ'লে যাবার পর বললাম, 'এত বেশি কথা বলেন না গোবিন্দবাবু—মুশকিল!' 'তা হয়তো বলেন,' তক্ষুনি ব'লে উঠলো রুক্‌মি, 'কিন্তু কাকাবাবু মানুষ খুব ভালো, কত আত্মীয়কে যে সাহায্য করেন ইয়ত্তা নেই, বাবার হাসপাতালেও দু-হাজার টাকা দান করেছেন।' 'এত বড়ো হোটেলের মালিক, দু-হাজার টাকা এমন আর বেশি কী।' রুক্‌মি শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে

বললো, 'এ-কথাটা তুমি ভালো বললে না।' আমার আবছা মনে পড়লো এ-রকম একটা কথা সে আগেও একবার বলেছিলো আমাকে।

কিন্তু ততক্ষণে আমি রাম্-এর গ্লাশ খালি করেছি, আমার মেজাজ এসে গেছে, দ্বিতীয়বার ঢেলে নিয়ে বললাম, 'তা বললে না তুমি পাটনায় কী করো সারাদিন?' সংক্ষেপে উত্তর দিলো, 'কাজের কি অভাব?' কোনো চাকরি করছো?' 'চাকরি ছাড়া কাজ হয় না বুঝি?' 'নয়তো কোনো পেশা—যেমন ডাক্তারি, ওকালতি, হোটেল চালানো—' 'বা বই লেখা,' আমার কথাটা শেষ করলো রুক্মি। 'কিন্তু অন্য কিছুও হ'তে পারে।' 'নিশ্চয়ই—যেমন মেয়েদের পক্ষে—' 'আমার মুখে এসেছিলো 'ঘরকন্না, ছেলেপুলে', কিন্তু জানি না কেন শেষ মুহূর্তে বদলে নিয়ে সাধুভাষায় বললাম, 'যেমন মেয়েদের পক্ষে সংসারধর্ম, মাতৃত্ব।' রুক্মি এ-কথাটার কোনো জবাব দিলো না, দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঐ যে, আমার চা এসে গেছে।' আমি পেয়ালাটি টীপয়ে রেখে বললাম, 'তুমি বোসো, রুক্মি, সেই গোবিন্দবাবুর আসা থেকে দাঁড়িয়ে আছো কেন?' রুক্মি সেই বেতের চেয়ারটা টেনে নিলো আবার, আমি কার্পেটে তার পায়ের কাছে ব'সে পড়লাম। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য একটু নিচু হ'তে হ'লো রুক্মিকে, আমি দেখতে পেলাম কালো চুলের মধ্যিখানে তার সরু সিঁথিতে একফোঁটা সিঁদুর-ছোঁওয়ানো, চেরা স্যাণ্ডেলের ফাঁকে তার পাৎলা শাদা পা দুটির গড়ন আমার চোখে পড়লো। 'কদ্দিন আছো তুমি দার্জিলিঙে?' 'ঠিক নেই কিছু। আর এক সপ্তাহ হয়তো।' 'ঘুরে-ঘুরে সব দেখেছো এখানকার?' 'সব কিনা জানি না, তবে বেরোলেই তো সেই স্নো-রেঞ্জ আর পাইন-বন আর বার্চ হিল্…যাকে বলে নৈসর্গিক শোভা, কিন্তু তাদের সঙ্গে তো কথা বলা যায় না।' 'তা-ই নাকি?' রুক্মি যেন কী ভাবলো একটুক্ষণ,

আমার দিকে একপলক তাকিয়ে জিগেস করলো, 'টাইগার হিল্-এ গিয়েছিলে?' 'রক্ষে করো, এই ঠাণ্ডায় রাত চারটেতে ঘুম থেকে ওঠা!' রুক্মি আর কিছু বললো না, মুখ নিচু ক'রে চায়ে চুমুক দিলো। আমি আবার বললাম, 'আমি ভেবেই পাই না কলকাতার বাইরে বারোমাস কী ক'রে কাটায় লোকেরা। তাই তো তোমাকে পাটনার কথা জিগেস করছিলাম। গগনবাবু তো সারাদিন কোর্টে থাকেন, তুমি বাড়ি ব'সে-ব'সে হাঁপিয়ে ওঠো নিশ্চয়ই?' 'অদ্ভুত একটা কথা বললে তুমি—' রুক্মির ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো, 'গগনবাবু ছাড়া বিশ্বজগতে আর-কিছু নেই নাকি?' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালো সে, আমার চোখে তাকে আগের চেয়ে লম্বা মনে হ'লো, তার শরীর আরো পুরেছে মনে হ'লো, যাকে বলে সুন্দরী এখন সে প্রায় তা-ই। 'চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি,' ব'লে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

তেমন ঠাণ্ডা ছিলো না রাতটা, এপ্রিল মাস চলছে, বাতাসে একটা আদর-আদর ভাব ছিলো। তার পাশে হাঁটতে-হাঁটতে আমি জিগেস করলাম, 'তোমরা পাটনায় ফিরে যাচ্ছো কবে?' 'আমার স্বামী যাচ্ছেন পর্শু, ঈস্টারের ছুটিতে এসেছিলেন, আমি আছি কিছুদিন।' 'কদ্দিন?' 'বর্ষা নামলে চ'লে যাবো। মা আজকাল এখানেই থাকেন বেশির ভাগ—এখানকার বাড়িটা খুব মনে ধরেছে তাঁর, বাবাও রোংটু থেকে প্রায়ই চ'লে আসেন—কাছেই, মোটরে মাত্র আড়াই ঘণ্টা এখান থেকে—কিন্তু থাকতে পারেন না বেশিদিন, তাঁর হাসপাতালের রোগীরা তাঁকে চোখে হারায়। আমি তাই মা-র কাছে এসে থাকি।' 'গগনবাবু আপত্তি করেন না তোমাকে ছেড়ে থাকতে?' 'আপত্তি কেন করবেন? তুমি তাঁকে ভাবো কী।' হালকা সুরে বললাম, 'আপত্তি হ'লে দোষের কথা নয় সেটা।' 'তাঁর কাছে তাঁর কাজের ওপরে কিছু নেই। অসাধারণ

মানুষ।' 'তোমারও তো খারাপ লাগতে পারে?' আমি আড়চোখে তাকালাম তার দিকে, সেও মুখ ফেরালো। 'তুমি কি ভাবো সব মেয়েই তোমার উপন্যাসের নায়িকাদের মতো?' 'কী বলছো বুঝতে পারছি না।' 'সবাই এত অস্থির, বিনা কারণে অসুখী···' 'এটা অস্থিরতারই যুগ'—এই বাঁধা উত্তরটা আমার মনে পড়লো না সে-মুহূর্তে, গম্ভীর গলায় বললাম, 'আমার সৌভাগ্য তুমি আমার বই পড়েছো।' 'সৌভাগ্য কেন হবে, তোমার কি পাঠকের অভাব?' আমার কেমন ধাক্কা লাগলো কথাটায়, মুখ-টুখ একটু লাল হ'লো বোধহয়, রুক্‌মি আমার চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করলো। 'রাগ করলে, ধীরাজ-দা?' আমি মুখ ফিরিয়ে হেসে বললাম, 'আমার আর যে-দোষই থাক, রাগ-টাগ নেই। আমার লেখা নিয়ে তুমি যা ইচ্ছে তা-ই বলতে পারো, আমার কিছুই মনে হবে না।' 'কিছুই এসে যায় না আসলে, তা-ই না?' 'হয়তো তা-ই—হুড়হুড় ক'রে লিখি, শেষ হওয়ামাত্র ভুলে যাই, এই আমার স্বভাব।'

ততক্ষণে চড়াই শুরু হ'য়ে গেছে—পরে যেটাকে ঘুর-পথ ব'লে জেনেছিলাম সেটাই নিয়েছে রুক্‌মি—রাস্তা ক্রমশ প্যাঁচালো হ'য়ে আসছে, খুব নির্জন। গাছপালার পেছনে প্রায়-অদৃশ্য কোনো বাড়ি থেকে গান ভেসে এলো হঠাৎ, রেডিও চলছে, কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাওয়ার মতো গলা অনেকক্ষণ ধ'রে অনুসরণ করলো আমাদের, আর সেটা মিলিয়ে যাবার পরে একেবারে যেন চুপ হ'য়ে গেলো সব, কোথাও একটা ঝিঁঝি পর্যন্ত ডাকছে না। আমার অদ্ভুত লাগলো।

হাওয়া-ঘর থেকে বাঁয়ে বেঁকে সরু রাস্তা নিলাম আমরা। ধাপে-ধাপে অন্ধকার জ'মে আছে, গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে ল্যাম্পোস্টগুলো এক-এক ঝলক আলো ঢেলে দিচ্ছে হঠাৎ, এক-একটি পেরোচ্ছি আর

রুক্মির আধখানা মুখ দেখতে পাচ্ছি···এখন আর কথা বলছি না আমরা, চড়াই উঠতে-উঠতে একটু হাঁপ ধরেছে ব'লে, না কি অন্য কোনো কারণে তা জানি না। আমার চোখ ব্যস্ত ছিলো রুক্মির ওপর, সে যখন মাথা হেঁট ক'রে চলছে তখন তার খোঁপাটা দেখছি, আর তার ঘাড়ের গড়ন, সে মুখ তুললে আমার চোখে পড়ছে তার গাল কেমন মসৃণ আর পরিশ্রমের জন্য আরো লালচে, চলার সময়ে শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে যে-সব ঝলকানি···অদ্ভুত, এই চুপচাপ প্যাঁচালো রাস্তায়, অন্ধকারে আলো আর ছায়ার মধ্যে বদল হ'তে-হ'তে···মনে হচ্ছে বুঝি এমনি হাঁটবো সারারাত···কিন্তু হঠাৎ আমার সামনে একটা আলোর দ্বীপ···রুক্মি কিছু বলার আগেই আমার মনে হ'লো এই বাড়িটাই ওদের। জানলায়-জানলায় আলো, দেখে মনে হয় ভেতরকার বাসিন্দারা খুব সুখী।

রুক্মি দাঁড়ালো একটু ফটকের ধারে। আমি বললাম, 'বেশ লাগলো এই পথটুকু হাঁটতে। দার্জিলিঙে এসে এই প্রথম আমি রাত ক'রে বেরোলাম।' 'এমন কী রাত। সবে তো ন-টা।' 'এখানে তো ন-টাতেই নিশুতি। তাছাড়া, জানো, আমি সঙ্গী ছাড়া তেমন সুখ পাই না কিছুতে। আজ তোমার জন্য ভালো লাগলো।' একটু চুপ ক'রে থেকে রুক্মি বললো, 'ভেতরে এসো না একবার। মা-বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও?' 'আজ থাক।' 'কবে আসছো বলো?' 'যেদিন বলবে।' 'কাল এসো—দুপুরে খেয়ে যেয়ো আমাদের সঙ্গে।'

বাগানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো রুক্‌মি, জানলা থেকে পড়া আধো-আলোর চৌখুপিতে সিঁড়ি পেরোলো, হারিয়ে গেলো বাড়িটার মধ্যে মুহূর্তের জন্য, তারপর উজ্জ্বল আলোয় ভেসে উঠলো আবার, একটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, কাঁধের ওপর শাল নেই এখন, হলদে ব্লাউজটা

যেন আলোর রঙে মিশে গেছে, মুহূর্তের জন্য আমার মনে হ'লো তার গা খালি।

'ধীরাজ-দা, তুমি দার্জিলিঙে আছো শুনে মা-বাবা খুব খুশি হয়েছেন। আজ হুপুরে তুমি আমাদের এখানে খাবে, তা মনে করিয়ে দিচ্ছি। যখন ইচ্ছে চ'লে এসো।—রুক্মি।' এই চিঠি, 'চন্দ্রকোণা' ছাপানো চিঠির কাগজ, বন্ধ খামে, সকাল সাতটার চায়ের সঙ্গে আমার বিছানার কাছে পৌঁছলো পরদিন, আমার চোখে তখনও ঘুম, শরীর অলস, একবার চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রাখলাম, হাসলাম মনে-মনে। যেন মুখে বলা যথেষ্ট হয়নি, আবার চিঠি লিখে পাঠিয়েছে—সব একেবারে নিয়ম-মাফিক, ভারি ভদ্র। অথচ ওরই মধ্যে একটা আপন-আপন ভাবও আছে—'যখন ইচ্ছে চ'লে এসো'! দেখা হ'লো অনেকদিন পরে··· বছর নয়েক হবে অন্তত, আর সেই তখন, রুক্মির বিয়ের আগে, কতটুকুই বা দেখাশোনা হয়েছিলো। কিন্তু কাল রাত্তিরে মীটিঙের পরে হঠাৎ-দেখার মধ্যে ভারি একটা চমক ছিলো সত্যি—একটা আলগা সম্পর্ককে যেন আঁটো ক'রে বেঁধে দিলো হঠাৎ—অন্তত সে-রকম একটা ভান করা হ'লো—তা বেশ, হাজির হবো ওখানে সময়মতো, আমার কিছুই করার নেই দার্জিলিঙে, হু-দিন বাদে উড়ে ফিরে যাবো কলকাতায়, এই ফাঁকা সময়টা মোটামুটি ভরিয়ে তোলা যাবে রুক্মিকে দিয়ে—ভালোই হ'লো।

'চন্দ্রকোণা'র ফটক দিয়ে অমি যখন ঢুকলাম, তখন বেলা বারোটা পেরিয়ে গেছে।

২

ওঁরা সকলেই সামনের ঘরটায় ব'সে ছিলেন, কিন্তু আমার যাঁকে প্রথম চোখে পড়লো তিনি গগনবরন মুন্সি। আমি তাঁকে এই প্রথম দেখলাম, কিন্তু চিনতে কোনো অসুবিধে হ'লো না।

একটা লম্বা সোফার ধার ঘেঁষে ব'সে একমনে খবর-কাগজ পড়ছেন গগনবরন (সামনের টেবিলে আরো দু-তিনটে ভাঁজ করা), আর সেই সোফারই অন্য ধারে রুক্‌মি, তার চোখ একটা ছবির বইয়ের ওপর নামানো, তার পায়ের কাছে একটা ব্রাউন-শাদা অ্যালসেশান তার বিশাল দেহ ছড়িয়ে দিয়েছে। দরজার ঠিক মুখোমুখি ছিলো সোফাটা, ওদের ওপর বাইরের আলো পড়েছিলো, আমি আধ-মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে অনেকটা দেখতে পেয়েছিলাম।

গগনবরনকে আমার মনে হ'লো সত্যিকার সুপুরুষ। শামলা-শামলা

রঙের ওপর পুরুষালি ধরনে সুশ্রী, মাথার কদমছাঁট চুলের জন্য কপালটা খুব চওড়া দেখাচ্ছে। মুখখানা গোল এবং বড়ো, মুখের ভাব ঠিক রাশভারি নয়, কিন্তু সমীহ করার মতো গম্ভীর, মনে হয় মানুষটা খুব খাঁটি মালমশলায় তৈরি। বাঙালিদের মুখে পাইপ দেখলে সাধারণত আমার মনে হয় স্রেফ চালিয়াতি, কিন্তু গগনবরনের দাঁতের ফাঁকে দিব্যি মানিয়ে গেছে সেটা, আর তাঁর গায়ের কচিপাতা-রঙের কার্ডিগান, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, চিকচিকে নীল মোজার তলায় কালোজাম-রঙের মোকাসিন—কোনোটাই অসাধারণ নয়, কিন্তু তিনি পরেছেন ব'লেই বিশেষ হ'য়ে উঠেছে যেন, আর ঠিক তেমনি নিখুঁত মানিয়ে গেছে তাঁর পাশে রুক্‌মিকে, কোলে ছবির বই আর পায়ের কাছে অ্যালসেশান আর কালো চুলের ফাঁকে লম্বা সরু সিঁথি নিয়ে রুক্‌মিকে। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে গেলো—রুক্‌মির জীবনের একটি বড়ো অংশ আমি জানি না, জানবো না কখনো।

আমাকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে এলো সে। 'এই যে ধীরাজ-দা, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো। আঃ, বুড্‌ঢা, চুপ!' অ্যালসেশানটি উঠে এসেছিলো রুক্‌মির সঙ্গে, বড়ো-বড়ো হলদে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে গাঁ-গাঁ আওয়াজ করছিলো। অস্ফুট স্বরে, রুক্‌মি তার মস্ত চোয়ালে চার আঙুলে ছোট্ট বড় বসালো, নিচু হ'য়ে ঘাড় চুলকে দিলো একবার, সে নেকড়ের ভঙ্গিতে ঘুরে গিয়ে একটি খালি সোফায় উঠে শুয়ে পড়লো। 'মা—বাবা—ধীরাজ-দাকে চিনতে পারছো নিশ্চয়ই? ...আমি এঁর কথাই বলছিলাম কাল রাত্রে—' স্বামীর দিকে তাকালো রুক্‌মি, গগনবরন হাতের কাগজ নামিয়ে আমাকে নমস্কার জানালেন। 'ও, হ্যাঁ, আপনিই নভেলিস্ট তো—বসুন, বসুন।' হরেন-মৃণালিনী আমাকে তাঁদের মাঝখানে বসিয়ে আলাপ শুরু করলেন—আমি 'এটুকু

বয়সেই' চব্বিশখানা বই লিখে ফেলেছি শুনে অবাক হলেন, একটু পরে ডিগবয়ের কথা মনে প'ড়ে গেলো তাঁদের—'তোমাকে দেখতে তোমার বাবার মতোই লাগে আজকাল,' 'তোমার মা লুকিয়ে-লুকিয়ে কবিতা লিখতেন তুমি জানো না বোধহয়?' তারপর আধা-পারিবারিক খবরাখবর, এক ফাঁকে দেখি রুক্মি এসে কাছে দাঁড়িয়েছে।

'ধীরাজ-দা, তুমি ফলের রস নেবে, না গিমলেট?'

'গিমলেট থাকতে অন্য কিছু—' হরেন-মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে আমি থেমে গেলাম, কিন্তু হরেন যখন শান্ত গলায় বললেন, 'ওতে কী আছে, তোমার যেটা ইচ্ছে নাও,' তখন স্বস্তি পেয়ে বললাম, 'আমারটায় বরফ দিয়ো না—এমনিতেই যা ঠাণ্ডা।' 'তুই এখানে বোস, রুক্মি—আমি যাচ্ছি—' মৃণালিনী উঠতে যাচ্ছিলেন, রুক্মি বাধা দিলো। 'তুমি সারা সকাল রান্না করলে, মা, এখন বোসো তো এখানে স্থির হয়ে।' 'অবন্তী কোথায়?' 'আছে বোধহয় নিজের ঘরে—ডেকে আনছি।' রুক্মি হালকা পায়ে বেরিয়ে গেলো, 'অবন্তী' নামটা খুব ঝাপসাভাবে চেনা মনে হ'লো আমার, মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে জিগেস করলাম, 'অবন্তী—কে বলুন তো?' 'আমার ছেলের এক বন্ধু—তোমার সঙ্গে শম্ভুর, মানে রুক্মির দাদার দেখা হয়নি কখনো?' 'কোথায় আর হ'লো—রুক্মির বিয়ের সময় তিনি আসেননি তো।' 'এই দ্যাখো না, এলো বিদেশে পাঁচ বছর কাটিয়ে, তারপর বাঙ্গালোরে চাকরি। বড্ড ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি আমরা।' 'তা-ই তো দেখছি। তবু যা হোক রুক্মি কাছাকাছি আছে।' 'তাছাড়া মেয়ে তো—আমাদের ছেড়ে থাকেনি কখনো, বড্ড টান।' মৃণালিনীর মুখে একটু ছায়া পড়লো যেন, আমি বুঝে নিলাম যে রুক্মি এখনো মা হয়নি—বাড়িতে কোনো শিশু থাকলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে দেখা যেতো।

গ্লাশ-সাজানো ট্রে হাতে নিয়ে রুক্মি ঘরে এলো, তার পেছনে অন্য একজন, তাকেও আমি আগে দেখিনি।

একটি যুবক, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে, রোগা চেহারা, মাথায় রুক্মিরও সমান নয়, মুখের রংটা হলদেটে ধরনের ফ্যাকাশে, চোখ দুটো উজ্জ্বল, চলে ঈষৎ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে, সে কাছে আসতেই রুক্মি মুখ ফিরিয়ে বললো, 'ধীরাজ-দা, এ-ই হ'লো অবন্তী ঘোষ—' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'বুঝতে পেরেছি, মাসিমা বলছিলেন এঁর কথা।' 'তোমাকে কয়েকটা ছবি দেখিয়েছিলাম মনে পড়ে—আমার দাদা আর অবন্তী একসঙ্গে?' 'ছবি?...তা-ই নাকি?' 'ভুলে গেছো তো?' রুক্মি কৌতুকের ভঙ্গিতে ঠোঁট কুঁচকে তাকালো আমার দিকে, তার বড়ো-বড়ো রুপোলি-কালো চোখ চাপা হাসিতে ঝলসে উঠলো, আমার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো সেই বিয়ে-বাড়ির কোণের ঘরটা, কালবোশেখির ধুলোর ঝড়, আর সেই যে রুক্মি চিঠি পড়ছিলো একমনে ব'সে। কিন্তু আমি যে ভুলে যাইনি সে-কথা রুক্মিকে জানাবার সময় পেলাম না, সে তক্ষুনি আবার বললো, 'তা যা-ই হোক, মনে রাখার মতো কিছু ব্যাপার নয় ওটা, এদিকে এসো, ধীরাজ-দা, আলাপ করো। এই তোমার গিমলেট। আর এই অবন্তীর লিম্বু-পানি।' রুক্মি স'রে গেলো গগনবাবুর কাছে, গিমলেটের অন্য গ্লাশটি তাঁর সামনে রেখে বললো, 'দ্যাখো, ঠিক হয়েছে কিনা।' রুক্মির দিকে না-তাকিয়ে গগন বললেন, 'থ্যাঙ্কস,' তারপর হাতেরটা নামিয়ে আর-একটা কাগজ তুলে নিলেন। রুক্মি একটা নিচু আসন টেনে নিয়ে আমার ও অবন্তীর মাঝখানে বসলো।

আমি অবন্তীর সঙ্গে আলাপ শুরু করার একটা সুযোগ পেলাম। 'আপনি টীটোট্যালার?' 'ঠিক তা নয়, তবে টাটকা পাতিলেবুর রস

আমার চমৎকার লাগে। এমন সুগন্ধ!' 'কয়েক ফোঁটা জিন মিশিয়ে নিলে আরো ভালো হয় না?' অবন্তী, যেন আমার কথাটা মেনে নিয়ে, মাথা নাড়লো, কিছু বললো না, আমার মনে হ'লো লোকটি তেমন আলাপি নয়। আবার চেষ্টা করলাম, 'আপনি কি কলকাতায় থাকেন?' 'হ্যাঁ, তা-ই।' এতক্ষণে একটি কলকাতার লোক পেয়ে আমার উৎসাহ জাগলো, তিনি কী করেন, কোন পাড়ায় থাকেন, এ-সব জিগেস করলাম।' 'তোমাকে বলিনি বুঝি?' রুক্মি তাকালো আমার দিকে—'অবন্তী য়ুনিভার্সিটিতে প্রোফেসর, পণ্ডিত মানুষ, সাবধানে কথা বোলো ওর সঙ্গে।' রুক্মির ঠাট্টার উত্তরে হালকা একটু হাসলো অবন্তী, আমি লক্ষ করলাম হাসলে তাকে সুন্দর দেখায়।

হঠাৎ গগনবরনের গলা শোনা গেলো। 'আপনাদের দু-জনকেই জিগেস করছি, পশ্চিম বাংলা কী-রকম চলছে?' 'কী-রকম মানে··· ?' 'কংগ্রেস সেখানে টিকবে ব'লে মনে হয় আপনাদের?' অবন্তী গালে হাত রেখে চুপ ক'রে রইলো প্রায় আধ মিনিট, তারপর আস্তে-আস্তে বললো, 'কংগ্রেস টিকবে কিনা তা কংগ্রেসের নেতাদের ওপর নির্ভর করছে।' গগনবরন সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু নেতাদের মতিগতি কী-রকম? আর লোকেদেরই বা অ্যাটিট্যুড কী?' 'সেটা—সেটাও আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি না।' 'জানা উচিত—আপনি অন্-দি-স্পট আছেন, এতগুলো ছাত্র নিয়ে আপনার কাজ।' অবন্তী উত্তর দিলো না, গগনবরন আমার দিকে চোখ ফেরালেন। 'ধীরাজবাবু, আপনার কী মনে হয় বলুন?' 'আমি দেখুন ও-সব রাজনীতি-টিতি—' 'সে কী! একজন প্রোফেসর, আর-একজন সাহিত্যিক—দু-জনেই আইভরি টাওয়ারের বাসিন্দা?' 'না, না, আমি একেবারেই তা নই, তবে—' একটু থামলাম আমি, তাকিয়ে দেখলাম

অবন্তী তার সোফাটার মধ্যে কুঁকড়ে প্রায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, এ-অবস্থায় আমি কিছু না-বললে মান থাকে না মনে হ'লো—'আমি অবশ্য খুঁটে-খুঁটে কাগজ পড়ি না আপনার মতো, তবে ময়দানের মিটিঙে গিয়েছি দু-চার বার, তাছাড়া ট্রামে-বাস্-এ ঘুরে বেড়াই তো—শুনি।' 'কী শোনেন?' গগনবাবু যেন সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে তাকালেন আমার দিকে। 'কী আর শুনবো। কংগ্রেসের বাপান্ত।' 'কিন্তু ক-জনের মুখে?' গগনবাবুর চওড়া কপালে রেখা ফুটলো, 'শতকরা ক-জন হবে আপনার মনে হয়?' 'শতকরা? আমি তো হিশেব রাখিনি।' আমি হাসলাম, কিন্তু গগন-বাবুর কপালের রেখা মিলোলো না। 'আনুমানিক বলুন।' 'এটুকু বলতে পারি যে আজকালকার ছেলেরা—' 'হ্যাঁ, বলুন বলুন।' '—ধরুন আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স—তারা প্রায় সকলেই একটু বাঁ-ঘেঁষা দেখছি।' 'কোন বাম?' তক্ষুনি আবার প্রশ্ন করলেন গগনবরন, 'ডাইনের দিকে বাম, না বাঁয়ের দিকে?' চট ক'রে একটা জবাব আমার মুখে এসে গেলো—'অনেকে আবার মধ্যিখানে শিবসদাগর।' আমার রসিকতাটা বেশ উপভোগ করলেন গগনবরন, পরমুহূর্তেই গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'তা সত্যি—কত ক্রস-কারেণ্টস আছে ভেতরে-ভেতরে, বাইরে থেকে বোঝা ভারি শক্ত। জওহরলাল আছেন, পশ্চিম বাংলায় বিধান রায় আছেন এখনো, তাই সব চলছে মোটামুটি, অন্তত মনে হচ্ছে তা-ই, কিন্তু বিধান রায়ের তো বয়স হ'লো, পাঁচ বছর বা দশ বছর পরে পশ্চিম বাংলার কী-অবস্থা দাঁড়াবে—মানে, দাঁড়াতে পারে, দাঁড়ানো সম্ভব, তা নিয়ে এখন থেকেই আমাদের ভাবা দরকার। এদিকে বিহারেও—' একটু থেমে, উপস্থিত সকলের ওপর চোখ ঘুরিয়ে এনে বললেন, 'বিহারে মনে হয় জানসাংঘ্ একটু-একটু ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ইলেকশনে আটটা সীট বেশি পেলো, তারপর সেদিন মজঃফরপুরের বাই-ইলেক্শনেও

পি. এস. পি-র ডেড-শু্যর রামচন্দরকে হারিয়ে দিলো। আমি ভাবছিলাম টিকিটটা যদি জানসাংঘ্ নিই, ওরা দিতেও চাচ্ছে আমাকে—এদিকে আবার কংগ্রেস খুব বনেদি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আছেন···আপনার কি কিছু মনে হয় এ-বিষয়ে?' ঘরের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্ন করলেন গগনবরন।

হরেন ডাক্তার মাথা চুলকোলেন। 'এ-সব ব্যাপার তুমিই ভালো বোঝো, গগন, তবে তুমি জিগেস করলে তাই বলছি—আমার মনে হয় পার্টির ছাপে কিছু এসে যায় না, দেশের কাজই আসল।'

'ঠিক কথা—কিন্তু ইলেকশনে জিৎলে তবে তো দেশের কাজ করার সুযোগ পাবো।'

হঠাৎ রুক্মি বললো, 'কেন, এমনিও কিছু করা যায় না কি? 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই', গগনবরন অমায়িকভাবে হাসলেন, 'যেমন তোমার বাবার হাসপাতালই ধরো না। চমৎকার—অ্যাডমিরেব্‌ল ইন ইটস ওয়ে, কিন্তু বেড মাত্র চোদ্দটি, আর রোংটুর চা-বাগানই তো সারাটা দেশ নয়।' 'ঠিক বলেছো, গগন,' বললেন হরেন ডাক্তার, 'তবে আমি অবশ্য দেশের কথা ভেবে করিনি ওটা, আমার নিজেরই জন্য করেছি।' 'সে যা-ই হোক, জেশ্চার হিশেবে খুব দামি ওটা—কিন্তু আমি যদি ধরুন বড়ো মাপে কিছু করতে চাই, যেমন ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিসের মতো কিছু, তাহ'লে বিধান-সভা লোক-সভা ছাড়া আর উপায় কী? কোন পার্টিতে যাবো, সেটাই এখন প্রশ্ন।'

'তা নিয়ে ভাবার কী আছে,' হালকা গলায় ব'লে উঠলো রুক্মি। 'যাদের আদর্শ তুমি সত্যি মানো তাদেরই সঙ্গে তুমি যোগ দেবে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই', অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লেন গগনবরন, 'সেটা

হ'লো একটা দিক, কিন্তু ভেবে দেখতে হবে আমার প্রস্‌পেক্টস্‌ কোথায় কী-রকম।'

একটা হাসির শব্দ হ'লো, আমি দেখলাম অবন্তী চেয়ারের মধ্যে তার শরীরটাকে মুচড়োচ্ছে, মস্ত বড়ো গদি-আঁটা চেয়ারে তার ছোটো শরীর ডুবিয়ে দিয়ে সে কেঁপে-কেঁপে উঠছে হাসি চাপার চেষ্টায়। চশমার পেছনে গগনবরনের চোখ দুটি স্থির হ'লো, পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমি কোনো হাসির কথা বলেছি জানতাম না।'

'মাপ করবেন, মিস্টার মুন্সি, আমি আপনার কথায় হাসছিলাম না, কিন্তু রুক্‌মি এমন একটা কথা বললো—আদর্শ! পলিটিক্সে—আদর্শ!' অবন্তীর গলা দিয়ে গমকে-গমকে হাসি বেরোলো কয়েকবার, রুক্‌মি লাল হ'য়ে বললো, 'থাক থাক, আর হাসতে হবে না পণ্ডিতমশাইকে। থামো!'

'না, না,' গগনবরন তাড়াতাড়ি বললেন, 'রুক্‌মিরও একটা পয়েন্ট আছে, প্রোফেসর ঘোষ, আদর্শ তো থাকতেই হবে, তুলে ধরতে হবে লোকের সামনে, কিন্তু তা-ই নিয়ে ব'সে থাকলে তো চলে না। যা দিয়ে কাজ এগোয়, যা দিয়ে লোকেদের খুশি রাখা যায়, সে-সব কলকব্জার খবর রুক্‌মি কী ক'রে রাখবে বলুন।'

'কী নিয়ে খুশি হ'তে হবে তাও তাদের শিখিয়ে দিতে হয়, মিস্টার মুন্সি। সেটাই লীডারশিপ।'

'আপনি বোঝেন দেখছি,' গগনবরনের মুখে হাসি ছড়ালো। 'এবারে বলুন তো, আপনার কী ধারণা, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের গলতিটা ঠিক কোথায় হচ্ছে?' 'তা নিয়ে তো কাগজেপত্রে রোজই লেখালেখি দেখছেন,' শুধু এই উত্তরটুকু দিয়ে হঠাৎ একেবারে আগের মতো চুপ হ'য়ে গেলো অবন্তী।

৩

'ধীরাজ-দা, তোমাকে আর-একটা গিমলেট এনে দিই?' আমি— জানি না কেন—অবন্তীর লিম্বুপানির দিকে তাকালাম, তার গ্লাশ তখনও অর্ধেক খালি হয়নি, খুব ছোটো-ছোটো চুমুকে অনেক ফাঁক দিয়ে-দিয়ে খাচ্ছিলো সে, যেন পাতিলেবু খাওয়াটা একটা বিরাট দায়িত্ব, সে যেন খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করছে এই অতি নির্দোষ পানীয়ের সঙ্গে— এদিকে আমি আমার সুস্বাদু জিন কয়েক ঢোঁকে নামিয়ে দিয়েছি। অবন্তীর এই অতি সাবধানী চুপচাপ ধরনটা কেমন বানানো ব'লে মনে হ'লো আমার, তাকে একটু খোঁচা দেবার জন্যই রুক্‌মির কথার উত্তরে বললাম, 'আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই—যদি অবশ্য অবন্তীবাবু কিছু মনে না করেন।' 'কী আশ্চর্য—আমি—আমি কিছু মনে করবো কেন?' চেয়ারের হাতলে টোকা দিতে-দিতে টেনে-টেনে কথাটা বললো অবন্তী,

যেন এই বাক্যটি রচনা করার জন্যও গভীরভাবে চিন্তা করতে হ'লো তাকে, আর রুক্মি ছলছলে গলায় ব'লে উঠলো, 'না, ধীরাজ-দা, আমাদের পণ্ডিতটির আর যে-দোষই থাক, সে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না।' দ্বিতীয় গিমলেটটিতে আমার জিহ্বা আরো সচল হ'লো—আমি নানাভাবে চেষ্টা করলাম অবন্তীকে কোনো কথার মধ্যে টানতে—তাকে জিগেস করলাম সে সম্প্রতি কোনো বাংলা ফিল্ম দেখেছে কিনা, কলকাতার নাটুকে দলগুলির মধ্যে কোনটিকে তার শ্রেষ্ঠ মনে হয়, ইউনাইটেড নেশন্স-এর ভবিষ্যৎ বিষয়ে তার ধারণা কী—এমনকি একবার আলবেয়ার কাম্যু আর এগ্‌জিস্টেনসিয়েলিজ়ম নিয়েও কথা তুললাম (ঐ ব্যাপারটা তখন কলকাতার হাওয়ায় জোর ভেসে বেড়াচ্ছে)—কিন্তু যে-কোন প্রশ্নেই অবন্তীর উত্তর সংক্ষিপ্ত ও কাটাছাঁটা; আমি যে সেটা খুব উপভোগ করলাম তা নয়, তার দিকে একটু কড়া ভঙ্গিতে পিঠ ফিরিয়ে রুক্মির কাছে জানতে চাইলাম রোংটুর চা-বাগানের আরো বিবরণ, তার বাবার হাসপাতালের কথা বলতে-বলতে রুক্মির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।—কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে অবন্তীর মুখে একটি ছোটো-খাটো বক্তৃতা শুনতে হ'লো আমাকে।

'দুটো টান কাজ করছে এই জগতে, একটা ভেঙে যাবার আর-একটা জোড়া লাগার—একদিকে সব-কিছু খ'সে-খ'সে পড়ছে—মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, পাথর, গ্রহনক্ষত্র—আবার অন্যদিকে সেই সব মালমশলা দিয়েই তৈরি হচ্ছে মানুষ, প্রাণী, পদার্থ—তারা নতুন, কিন্তু আনকোরা নতুন নয়, কেননা জগতে কোনো নতুন মালমশলা নেই, যা আছে সেটাকে খুঁজে পাওয়ার নামই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—অতএব যা ভাঙলো আর যা নতুন হ'লো এ-দুয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র

থেকেই যায়—আমরা তা বুঝি আর না-ই বুঝি—আর সেই সূত্রটি, সেটাই বোধহয় একমাত্র যাকে বলা যায় স্থির, নয়তো ধীরাজবাবু যা বলেছেন সেটাই ঠিক কথা, কোথাও কোনো স্থিরতা নেই, কিছুদিন বেঁচে থাকার পরে আমরা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়েও তা-ই বুঝি।'—এই ধরনের কোনো কথা বোধহয় বলেছিলো অবন্তী (হঠাৎ তার মুখ খুলে গেছে, আশ্চর্য !) যখন রুক্‌মি আমার হিমানী হোটেলের বক্তৃতার কথা তুলেছিলো, আমি অনেকবার চেষ্টা ক'রেও চাপা দিতে পারিনি। কিন্তু আমি মৃণালিনীর মটন-রেজ়ালা একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম, আমার ঝিমুনি আসছিলো, সব কথা শুনতে পাইনি বা শুনতে ইচ্ছেও করিনি (কী এসে যায় স্থির কিছু থাকলে বা না-থাকলে ?)—মাঝে-মাঝে আমার চোখ চ'লে যাচ্ছে জানলার বাইরে বাগানে—সেখানে সবুজ ঘাসে হলুদ রোদ্দুরে জ্বলজ্বল করছে ফুলগুলো—আর মাঝে-মাঝে আমি ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখছি : মস্ত ঘর দুই অংশে ভাগ-করা, সামনের দিকটা লম্বা আর চৌকো যেখানে খাবার আগে আমরা বসেছিলাম, আর পেছনে দু-সিঁড়ি নিচুতে একট ছোটো অর্ধচন্দ্রাকৃতি অংশ যেখানে জানলা-ঘেঁষা গোল ছাঁদের বেঞ্চিতে আমরা তিনজন এখন ব'সে আছি আর কুশানগুলো বেশ তেতে উঠছে রোদ্দুরে—আর কত কী সাজসজ্জা চারদিকে, জাপানি ছবি, তিব্বতি মুখোশ ইত্যাদি, হরেক রকমের পুতুল, তার কোনটা বর্মি কোনটা থাই আর কোনটা নেপালি তা রুক্‌মি আমাকে ব'লে দিয়েছিলো পরে, এক কোণে কাচের বাক্সে একটি কাঠের বুদ্ধ, ভেতরে যাবার দরজার দু-ধারে দুটো লম্বা শেলফ-ভর্তি বই—বড্ড বেশি সাজানো আমার মনে হয়েছিলো, অবন্তী কী বলছে তার মাথামুণ্ডু নেই, আমার মনে পড়ছিলো ধরমতলার কাপ্রি কাফে যেখানে কেউ বিদ্বান নয় বুড়োটে নয় পাঁশুটে

নয়—এদিকে অবন্তীর গলা গুলিসুতোর মতো খুলে যাচ্ছে··· 'আর এই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে-যাওয়া জগৎটাকে যা ধ'রে রাখছে, খ'সে-খ'সে-পড়া মালমশলাগুলোয় জোড়া দিচ্ছে, সেটারই আমরা নাম দিতে পারি ভালোবাসা। অনেক সময় জীবনটাকে খুব এলোমেলো মনে হয়, ইতিহাসকে দুঃস্বপ্নের মতো লাগে, তবু তো আমাদের রক্তচলাচল ছন্দে বাঁধা, পৃথিবীতে ঋতুবদল ছন্দে বাঁধা—এমনকি আমরা যে-স্বপ্ন দেখি, যা মনে হয় একেবারেই আবোলতাবোল, তারও মধ্যে একটা ছন্দ আছে ব'লে প্রমাণ হয়েছে—আর ছন্দ কোত্থেকে আসবে, বলো, যদি না পেছনে কোথাও ভালোবাসা থাকে?' 'তুমি থামো, অবন্তী, তোমার কথা শুনতে-শুনতে ধীরাজ-দা ঘুমিয়ে পড়ছেন, যা একঘেয়ে তোমার গলা, তোমার ছাত্ররা কী ক'রে জেগে থাকে জানি না।' আমি চোখ খুলে বললাম, 'কী বললেন, অবন্তীবাবু, ভালোবাসা? ভালোবাসা ব'লে কিছু আছে নাকি?' অবন্তী হাসলো, কিছু বললো না। আমি ঠাট্টার সুর আর-একটু চড়িয়ে আবার বললাম, 'আপনি বললেন না ছন্দ? কিন্তু ছন্দের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক কী? কবিতা তো ছন্দে লেখা হয়, তাই ব'লে কথাগুলো কি পরস্পরকে ভালোবাসে বলবেন?' 'তা বাসে বইকি; যেমন কোনো মেয়ের প্রেমে-পড়া অবস্থাটা তার চোখে ঠোঁটে লজ্জার রঙে এমনকি আঙুলগুলোর নড়াচড়াতেও ধরা প'ড়ে যায়, তেমনি এক কথার সঙ্গে অন্য কথার ভালোবাসাকেই আমরা ব'লে থাকি ছন্দ মিল অনুপ্রাস ও ধ্বনিমাধুর্য। কোনো কবি যখন একটি সুন্দর লাইন লেখেন, তিনি আর-কিছুই করেন না—শুধু সেই গোপন ভালোবাসাকেই ফুটিয়ে তোলেন।' আমি আধো-ঘুমন্ত গলায় বললাম, 'তা দেখুন আমার উপন্যাসগুলো অত্যন্ত সহজ সরল, কাল আমি বেটপকা কী ব'লে ফেলেছিলুম আজ আমার তা মনেও নেই, তা থেকে

এত তত্ত্বকথা গজিয়ে উঠতে পারে তাও আমি কল্পনা করিনি—কিন্তু আমার মগজে কিছুই ঢুকছে না, আপনি বুঝিয়ে দিলে বাধিত হবো, অবন্তীবাবু।' 'সে আর-একদিন হবে,' ব'লে অবন্তী উঠে দাঁড়ালো। 'এখন আমার একটু কাজ আছে—আশা করি আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।' 'বেড়াতে এসেও আপনার এত কী কাজ?' রুক্মি জবাব দিলো, 'অবন্তী একটা বই লেখার কথা ভাবছে, তাই ব্যস্ত!' 'তাই ব্যস্ত? শুরু করেননি এখনো?' 'আগে কিছু প'ড়ে নিতে হচ্ছে।' আমার ভাবতে ভালো লাগলো যে আমাকে বই লেখার জন্য বই পড়তে হয় না, আলগোছে বললাম, 'ও, গবেষণার বই?'—আমার গলায় ব্যঙ্গের ছোঁওয়া লুকোনো রইলো না। 'গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা!'—হালকা হাসির আওয়াজ ক'রে ব'লে উঠলো রুক্মি, 'স্মৃতি কী, আমরা ভুলে যাই কেন, সত্যি ভুলি কিনা, মনে রাখা আর ভুলে যাওয়ার তফাৎটা কী—এই সব হিজিবিজবিজ ব্যাপার—কে বা পড়বে ও-বই আর কে বা বুঝবে!' 'তুমি লেখা হবার আগেই বুঝে ফেলেছো মনে হচ্ছে, চমৎকার চুম্বক ব'লে দিলে!' হাসলো অবন্তী, আমি আরো একবার তাকে সুন্দর দেখলাম। 'আচ্ছা প্রোফেসর-সাহেব, আমরা ছুটি দিচ্ছি আপনাকে, আপনি আপনার কাজে যান। ধীরাজ-দা, চলো আমাদের বাগান দেখবে,' বলতে-বলতে রুক্মিও উঠে দাঁড়ালো।

বাগানে এক পাক ঘুরে আমি বললাম, 'গগনবাবুকে দেখছি না?' 'তিনি তো খেয়ে উঠেই বেরিয়ে গেলেন, মাউণ্ট এভারেস্টে বিহারের এক মন্ত্রী এসেছেন তাই দেখা করতে।' 'আমি ভেবে পাই না কোন সুখে মানুষ রাজনীতি করে, মন্ত্রী-টন্ত্রী হ'তে চায়।' 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলো কেন? আস্ত একটা দেশকে চালানো—সে তো সোজা কথা

নয়, সে-যোগ্যতাই বা ক-টা লোকের থাকে।' কথাটার সুর ঝাঁঝালো হ'তে পারতো, হওয়া উচিত ছিলো তা-ই—কিন্তু এটাও নরম হ'য়ে বেরোলো তার গলা থেকে, রুক্মি যেন গলা চড়াতে জানেই না। অত যে ঠাট্টা করে অবন্তীকে, তাও কেমন মখমলে মোড়া মনে হয়।

অবন্তীর কথা মনে পড়ামাত্র একটা জবাব খুঁজে পেলাম।—'রাজনীতি কিছু বুঝি বা না বুঝি, তবু তো দুটো কথা বলেছিলুম গগনবাবুর সঙ্গে। আর অবন্তী মুখে তালা দিয়ে রইলো! অদ্ভুত!' 'কী-অর্থে অদ্ভুত বলছো?' 'কেমন খোলশের মধ্যে ঢুকে থাকে সারাক্ষণ, কেউ কিছু জিগেস করলে জবাব দেয় না—আর গগনবাবুর কথার মধ্যে ঐ যে হেসে উঠলো তখন—' 'তা সত্যি, সেটা খুব অন্যায় হয়েছে ওর। কিন্তু ও ঐরকমই মানুষ—ওকে আর শোধরানো গেলো না।' আমি ব'লে উঠলাম, 'কিছু মনে না করো তো বলি— আমি ধ'রে নিচ্ছি অবন্তীবাবু মস্ত বিদ্বান, কিন্তু আমার মনে হয় ওঁর বিদ্যে যতটা আছে, বিদ্যের দেমাকও আছে ততটাই। অন্যদের একটু চোখে কম দ্যাখেন।' 'না, না, দেমাক নয়, আসলে ও বড্ড লাজুক।' 'লাজুক! এত দেশ-বিদেশ ঘুরে এলেন, প্রোফেসরি করছেন—এখনো লাজুক! একঘর লোকের মধ্যে ওঁর চুপ ক'রে থাকার ক্ষমতাটা আমার ভারি আশ্চর্য ব'লে মনে হ'লো।' 'তা মনোমতো বিষয় পেলে খুব কথা বলে।' 'ঐ যেমন ছন্দ আর ভালোবাসা নিয়ে বক্তৃতা! ঠিক যেন ক্লাশ পড়াচ্ছিলো—তা-ই না?' 'ঠিক তা-ই।' একটু চুপ ক'রে থেকে রুক্মি বললো, 'তোমার কথা বলো, ধীরাজ-দা। অনেক বই লিখে ফেলেছো, তা-ই না?' 'হ্যাঁ, বড্ড বেশি—তা কী করি বলো, সম্পাদক আর প্রকাশকেরা মিলে তিষ্ঠোতে দেয় না যে আমাকে।' আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে রুক্মি বললো, 'এ-রকম ক্ষমতা নিয়ে জন্মানো—সত্যি ভাগ্যের কথা।

আমি পাটনায় একটি মেয়েকে চিনি, সে পাগলের মতো তোমার ভক্ত, তোমার এমন কোনো লেখা নেই যা সে পড়েনি।' আমি জানি আমার মেয়ে-ভক্তরা নানা শহরে কোণে ঘুপচিতে লুকিয়ে আছে, তাই খবরটা শুনে বেশি বিচলিত হলাম না। রুক্মি আবার বললো, 'সে একবার একটা চিঠিও লিখেছিলো তোমাকে—কোনো উত্তর পায়নি, আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে বিখ্যাত লোকদের চিঠি লেখার সময় নেই।' 'আসল কথা কী জানো—ছাপাখানার জন্য লিখে-লিখেই আমার দম ফুরিয়ে যায়, চিঠির জন্য আর উৎসাহ বাকি থাকে না।' 'তা সত্যি—সেদিক থেকে সাধারণ লোকেরা অনেক ভালো আছে—তাদের চিঠি লেখার সময়ের অভাব হয় না।' আমি হঠাৎ বললাম, 'অবন্তীবাবু কি এখনো তেমনি লম্বা-লম্বা চিঠি লেখেন তোমাকে?' 'দেখছো তো ও কথাবার্তায় তেমন পটু নয়, তাই বোধহয় ওর আঙুলে একটা চিঠি লেখার চুলকোনি আছে। নানা দেশে ওর চিঠি লেখার লোক আছে—মাঝে-মাঝে আমার দিকেও ছুঁড়ে দেয় দু-একটা।' 'মনে হচ্ছে তুমি অনেকদিন ধ'রে চেনো অবন্তীকে?' 'হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই, মাঝে বহুকাল দেখা হয়নি অবশ্য—কিন্তু ছেলেবেলায় ও অন্য রকম ছিলো।—এসো, একটু বসা যাক ওখানটায়।'

বাগানের এক কোণে শাদা-রং-করা লোহার বেঞ্চি বসানো ছিলো, সেখানে ব'সে অবন্তীর পূর্ব-ইতিহাস আমাকে কিছু শোনালো রুক্মি। আমি শুনে গেলাম, অবন্তীর বিষয়ে আমার কৌতূহল বেশ তেতে উঠেছে ততক্ষণে।

অবন্তীকে বর্মা থেকেই চিনতো রুকমিরা—ওর বাবা সেখানকার ক্যাণ্টনমেণ্টে এঞ্জিনিয়র ছিলেন। খুব টগবগে আর হৈ-চৈওলা ছিলো তখন, ডানপিটে গোছের, দৌড়ঝাঁপ সাঁতার নিয়ে মেতে আছে, কোথাও

সাপ বেরিয়েছে শুনলে লাঠি নিয়ে মারতে ছুটে যায়। ওর বাবা ভাবছেন ওকে আর্মির জন্য তৈরি করবেন—তখনও দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয়নি কিন্তু সোরগোল শোনা যাচ্ছে—এমন সময়, ওর বয়স তখন বারো-টারো হবে, অবন্তী একদিন গাছে চড়তে গিয়ে প'ড়ে গেলো। পড়লো এমনভাবে যে ছাব্বিশটা না বত্রিশটা হাড় চুরমার। হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হ'লো ছ-মাস, সেরেও উঠলো, কিন্তু পায়ের ঐ খুঁতটা আর মেরামত হ'লো না। আর তারপরেই অন্য মানুষ হ'য়ে গেলো অবন্তী। শরীরে বেশি বাড়লো না আর, কিন্তু হঠাৎ ভীষণ পড়ুয়া ছেলে হ'য়ে উঠলো, বাড়ি থেকে বেশি বেরোয় না, চুপচাপ থাকে। পরের বছর পড়তে চ'লে এলো কলকাতায়, রুক্মিদের সঙ্গে জাপানি বোমার সময় আবার যখন দেখা, তখন সে ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে আর তার চেনাশোনারা সবাই বলছে অবন্তীর মতো ছাত্র আর হয় না।

'এক ধাক্কায় পালোয়ান থেকে পেডেণ্ডো!' আমি হেসে উঠলাম, রুক্মিও যোগ দিলো সেই হাসিতে। 'ওর মুখে এই প'ড়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা শুনলে তুমি আরো হাসবে, ধীরাজ-দা। "ভাগ্যে প'ড়ে গিয়েছিলাম, নয়তো মানুষ মারার পেশা নিতে হ'তো। হয়তো ইচ্ছে ক'রেই পড়েছিলাম যাতে ছোটো ফাঁড়ার জন্যে বড়ো ফাঁড়াটা কেটে যায়।" এমন থিওরিবাজ মানুষ না অবন্তী!' 'তোমার দাদার সঙ্গে কি বর্মা থেকেই বন্ধুতা ওঁর?' 'আরম্ভ সেখান থেকেই, কিন্তু মাঝে কয়েকটা বছর দেখাশোনা হয়নি, তারপর দাদাও এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হ'লো—সায়ান্সে—আর সেই সূত্রেই আমাদের সঙ্গে বন্ধুতা জ'মে উঠলো অবন্তীর।' রুক্মির মুখে 'আমাদের' কথাটা একটু খোঁচা দিলো আমাকে, জিগেস করলাম, 'দাদার বন্ধু, বয়সেও বড়ো তোমার—নাম ধ'রে বলো কেন?' 'ছেলেবেলায় তা-ই বলতাম তো, অভ্যেসটা

থেকে গেছে। ' "অবন্তী-দা" বলতে না কখনো ?' 'যা ডানপিটে ছিলো তখন—ওকে "দাদা" বলার কথা মনেই হয়নি আমার।' হালকা হাসলো রুক্মি, বাগানের লম্বা-হ'য়ে-পড়া ছায়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভেতরে চলো, চা খাবে।'

৪

আমি শরীরটাতে ঝাঁকনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কী করছি আমি এখানে ব'সে—এক বিবাহিত ভদ্রমহিলার মুখে তাঁর বাল্যবন্ধুর জীবন-চরিত শোনার কী-দরকার ছিলো আমার? হ'লোই বা এটা দার্জিলিং, কলকাতা নয়—তাই ব'লে কি আর-কিছু আমার করার নেই? রুক্মির সঙ্গে দেখা হবার আগেও তো দিব্যি আমার সময় কেটে যাচ্ছিলো, হিমানী হোটেলে গোবিন্দবাবুর আদর-যত্ন পেয়ে, মাঝে-মাঝে তাঁর অদর্শনা স্ত্রীর হাতের রান্নায় রসনাকে পরিতৃপ্ত ক'রে, ম্যাল্-এ ঘুরতে-ঘুরতে কলকাতার তরুণীদের প্রশংসাদৃষ্টির অভিনন্দন পেয়ে, আমার অভাব কিসের যে 'চন্দ্রকোণা'তেই সারাটা দুপুর কাটাতে হবে? 'বলো তো তোমার চা এখানেই এনে দিই?' 'না, না, আমি এখন চা খাবো না—চলি।' 'আমার স্বামীর আসার সময় হ'লো, তাঁর সঙ্গে দেখা

ক'রে যাবে না?' 'সে পরে হবে—উনি আছেন তো আরো কয়েকদিন?' 'কালকের দিনটাই আছেন শুধু, ওঁর কোর্ট খুলে যাচ্ছে—ঐ যে, উনি এসে গেছেন।' রুক্‌মি এগিয়ে গেলো ফটকের দিকে, তাঁর ভারি, গম্ভীর, সুশ্রী চেহারাটি নিয়ে গগনবরন দ্রুত পায়ে বাগান পেরিয়ে বাড়ির দিকে চললেন; হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে বললেন, 'এই যে ধীরাজবাবু, ওখানে একা দাঁড়িয়ে কী করছেন, নভেলের প্লট ভাবছেন নাকি?' রুক্‌মি বললো, 'ধীরাজ-দা চ'লে যেতে চাচ্ছেন, আমি ওঁকে বলছিলাম—' 'আরে সে কী হয়!' আমার পক্ষে আশাতীত কামারাদেরির সুরে ব'লে উঠলেন গগনবরন, 'আসুন ভেতরে, গপ্পো-সপ্পো করা যাক। আপনার ঔদরিক অবস্থা কী-রকম? দার্জিলিঙের মস্ত দোষ এই যে বড্ড ঘন-ঘন খিদে পায়, বলতে-বলতে তাঁর বাচ্চা-ভুঁড়িটির ওপর যেন আদর ক'রে একবার হাত বুলোলেন তিনি। তাঁর পরনে সরু-ডোরা-কাটা ঘন-নীল রঙের ওয়েস্‌কোট-সুদ্ধ স্যুট; জুতোজোড়া আয়নার মতো ঝকঝক করছে, কোটের সবগুলো বোতাম আঁটা, গলার তলায় জবা-রঙের নেকটাইয়ের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা যেন তাঁকে ছাড়া অত সুন্দরভাবে আর কাউকে মানাতো না—আমার মনে হ'লো স্বাস্থ্যে সুখে উৎসাহে তিনি টগবগ করছেন, নিশ্চয়ই মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা অতিশয় সন্তোষজনক হয়েছিলো। চওড়া মুখে হাসির ভাঁজ ফেলে বললেন, 'রুক্‌মি, আজ চায়ের সঙ্গে শিঙাড়া হবে নাকি? শুকনো স্যাণ্ডুইচ আর ক্রীম-রোল থেকে আজ রেহাই পেতে চাই—নাথিং লাইক হোম-মেইড শিঙাড়াজ্‌। আমি রেসিপি ব'লে দিচ্ছি—আলু আর মটরশুঁটি আর অল্প কিশমিশ আর পেস্তা।—কী বলেন ধীরাজবাবু, আপনার রুচবে তো?' আমি গগনবরনের সুরে সুর মিলিয়ে বললাম,

'উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু রুক্‌মি তৈরি করলে কেমন হবে তা-ই ভাবছি।' কথা বলতে-বলতে বসার ঘরে চ'লে এসেছিলাম আমরা, একটি সোফায় নিজের শরীরটিকে নামিয়ে দিয়ে গগবরন দরাজ গলায় বললেন, 'আরে মশাই রুক্‌মির আপনি কতটুকু জানেন—একবার বেড়াতে আসুন পাটনায়, সেখানে আমাদের গোয়ান রাঁধুনিও আছে, কিন্তু গঙ্গার ইলিশ বা গলদা-চিংড়ি বা মুড়িঘণ্টর মতো সেরা আইটেমগুলো বঙ্গমহিলার রন্ধনপ্রতিভারই অপেক্ষা ক'রে থাকে। স্বামীর জিভের সোয়াদ, আর স্ত্রীর রান্নার হাত—এ-দুয়ের কম্বিনেশনকেই তো বলে দাম্পত্য সুখ!' বলতে-বলতে গায়ের কোট আর নেকটাই খুলে সোফায় হেলান দিয়ে তিনি হাঁক দিলেন—'বাহাদুর!' সঙ্গে-সঙ্গে একটি গোল-টুপি-পরা নেপালি বালক-ভৃত্য এসে তাঁর সামনে রাখলো কার্পেটের চটি, মেঝেতে নিচু হ'য়ে পায়ের জুতো খুলে নিলো, একহাতে জুতো আর অন্য হাতে কোট টাই হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে ভেতরে চ'লে গেলো। রুক্‌মি ততক্ষণে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

পাইপে দু-চারবার টান দিয়ে গগনবরন আমার দিকে সরু চোখে তাকালেন। 'আপনি কী-ধরনের নভেল লেখেন? পলিটিক্‌ল?' 'না—না, পলিটিক্‌ল নয়, আপনাকে তো আগেই বলেছি রাজনীতির আমি কিছুই বুঝি না।' 'তাহ'লে—সোশ্যল?' 'তা—তা বলতে পারেন, কিন্তু পুরোপুরি তাও হয়তো নয়।' 'একটু বুঝিয়ে বলুন।' মানে—আমি কয়েকজন মানুষকে ভাবি, তাদের চেহারা, ভাবভঙ্গি, মতিগতি—তাদের নিয়েই আমার কারবার।' ধনুকের মতো ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটিয়ে গগবরন বললেন, 'বাট্ ম্যান ইজ্ এ সোশ্যল অ্যানিম্যাল, ইজ্'ণ্ট ইট্? আপনি সমাজকে বাইরে রেখে মানুষের কথা লিখবেন কী ক'রে?' 'তা সমাজ আমার বইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে চায় তো

ঢুকবে—কিন্তু আমার তা নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই।' 'ও, বলতে চান আপনি সাইকলজিক্ল স্কুলের?' 'ঠিক জানি না, সাইকলজিক্ল স্কুল বলতে কী বোঝায় সে-বিষয়ে আমার ধারণা নেই, যা মনে আসে লিখি—এই আরকি।' 'ওয়েল, ওয়েল,' পাইপের গায়ে টোকা দিয়ে গগনবরন বলতে লাগলেন, 'আমি দেখুন নভেল-টভেলের পোকা নই, ইচ্ছে থাকলেও আমার প্রোফেশনের চাপে সময় পাই না—কিন্তু বাংলা হিন্দিতে যা পড়েছি তা থেকে আমার একটা কথা মনে হয়েছে—আচ্ছা, আপনাকেই জিগেস করি, আপনার বইয়ে কোনো অবাঙালি চরিত্র থাকে কি?' 'কী ক'রে থাকবে, আমি কোনো অবাঙালিকে চিনিই না।' 'সেই তো কথা—' গগনবরনের কপালে চিন্তার রেখা পড়লো—'আমাদের দেশের সাহিত্য এখনো রিজিয়নেল থেকে যাচ্ছে—ভারতীয় হ'তে পারছে না, ন্যাশনাল হ'তে পারছে না। বাঙালিরা লিখছে শুধু বাঙালিকে নিয়ে; হিন্দিকে যদিও ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ বলা হচ্ছে, হিন্দি লেখকরাও বিহার, উত্তরপ্রদেশেই আটকে আছেন—আমি যদ্দূর জানি, অন্যান্য ভাষাতেও তা-ই অবস্থা, কোথাও কোনো প্যান-ইণ্ডিয়ান পার্সপেক্‌টিভ নেই।' 'থাকতেও পারে না—আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা, এমনকি খাওয়াদাওয়া পোশাক পর্যন্ত আলাদা—এ অবস্থায়, যাদের বিষয়ে খুঁটিনাটি সব জানি, এক ভাষায় কথা বলি যাদের সঙ্গে, জন্ম থেকে যাদের প্রতিদিন দেখে আসছি, তাদের নিয়েই আমরা বই লিখবো সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?' 'না, না, এটা আপনি ঠিক কথা বললেন না,' গগনবরন পিঠ টান ক'রে ব'সে ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বললেন, 'এই ধরনের মনোভাব থেকেই সব ফিসিপেরাস টেণ্ডেন্সি দেখা দেয়।' 'ফিসিপেরাস মানে?' 'মানে হ'লো—' আমাকে কথাটা বোঝাতে পেয়ে বেশ খুশি হলেন গগনবরন—"ফিশন" থেকে

আসছে কথাটা, কোনো-কোনো প্রাণী শরীরটাকে দু-টুকরো ক'রে ফেলে বংশবৃদ্ধি করে জানেন তো—আলাদা হ'য়ে যাবার ঝোঁক, তাকেই বলে "ফিসিপেরাস"—এই যেমন তামিল নাড়ুতে দেখা যাচ্ছে, নাগাল্যাণ্ডে দেখা যাচ্ছে।' 'এ-সব সমস্যার সমাধানের জন্যই তো আপনারা আছেন, মিষ্টর মুন্সি, আপনারা যারা বিধানসভা লোকসভার সদস্য হ'তে চলেছেন, কোনো-একদিন মন্ত্রীও হবেন আশা করা যায়—আমরা ঘরে ব'সে শুধু বই লিখি, আমরা কী করতে পারি এ নিয়ে?' 'বলেন কী!' এবারে গগনবরনের গলা আরো উত্তেজিত শোনালো, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা ইংরেজ আমলে বাস করছি এখনো—দুটো চারটে ভাবের কথা লেখা ছাড়া আর-কিছুই হাতে নেই আমাদের। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক—অনেক কাজ আমাদের সামনে, ভারতবর্ষকে তার সব দুর্দশা থেকে টেনে তুলতে হবে—আমরা কি আশা করতে পারি না যে আমাদের সাহিত্যিকেরাও এই নেশন-বিল্ডিঙের কাজে কনট্রিবিউট করবেন—দেশের লোকের মনে উৎসাহ জাগিয়ে, আশা জাগিয়ে, ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার ছবি তুলে ধ'রে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে লুকোনো মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলে? ফুরফুরে বাবু-সাহিত্য ঢের হ'লো, এখন আমরা বলিষ্ঠ বাস্তবনিষ্ঠ সাহিত্য চাই, যার মধ্য দিয়ে সত্যিকার দেশকে ও দেশের লোককে আমরা চিনতে পারবো।'

আমি জবাব না-দিয়ে গগনবরনের দিকে তাকালাম একবার। তিনি ব'সে আছেন কার্পেটের চটি-পরা পা দুটিকে মেঝের পুরু গালিচার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে, তাঁর পায়ের নাইলন-মোজা চিকচিক করছে, তাঁর শার্টের হাতায় টকটকে লাল পাথরের বোতাম ঝিলিক দিচ্ছে—এমন দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি কথাগুলো বললেন যে নিজেকে আমার প্রায় অপরাধী

মনে হ'লো দেশের কথা কিছু লিখি না ব'লে, আমার মুখে তক্ষুনি কোনো জবাব জোগালো না। মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে গগনবরন একটি ছোট্ট প্রশ্ন করলেন আমাকে—'আপনার লেখায় সেক্স থাকে?' 'আজ্ঞে?' 'জিগেস করছি,' গগনবরন সকৌতুকে চোখের পাতা মিটমিট করলেন, 'আপনার লেখার রুটি-মাখনের ওপর সেক্স-এর মধু বেশ পুরু ক'রে বিছিয়ে দেন কি?' 'যদি অনুগ্রহ ক'রে আমার দু-একটা বই পড়েন তাহ'লেই তা জানতে পারবেন—আমি নিজের লেখার বিষয়ে কথা বলতে ভালোবাসি না।' 'কিছু মনে করবেন না, ধীরাজবাবু—' আমি শুনেছি বাংলাদেশে এ-রকম একটা হাওয়া বইছে আজকাল, তাই জিগেস করলাম। সত্যি কি তা-ই? বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের দেশ কি এতই নিচে নেমে যাচ্ছে?' 'রবীন্দ্রনাথের নামটা বাদ দিলে ভালো করতেন—আপনি নিশ্চয়ই জানেন তাঁর "চিত্রাঙ্গদা" "ঘরে বাইরে" নিয়েও হুলুস্থুল হয়েছিলো এককালে?' 'আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন, ধীরাজবাবু?—গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, ভেবে দেখুন তাঁর "কথা ও কাহিনী"—"পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে দেখিতে-দেখিতে—"' এর পরে আর মনে করতে পারলেন না গগনবরন, হাত নেড়ে বললেন, 'হাও নোব্‌ল্! হাও ইন্সপায়ারিং! এ ট্রাম্পেট কল টু ফ্রিডম-ফাইটার্স! আর তার বদলে এখন—বাংলাদেশের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, সেখানে অনেক আগে থেকেই সমাজের বুনিয়াদ ধ্ব'সে পড়ছে, কিন্তু রক্ষণশীল বিহারকেও যেন ঘুণে ধরেছে মনে হয়, পাটনাতে সেদিন একটা অবসিনিটির মামলা হ'য়ে গেলো।' আমি ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ না-ক'রে পারলাম না—'তা-ই নাকি? বিহারেও?' 'শুনুন তা'হলে—রামশরণ দ্বিবেদী, নাম শুনেছেন কিনা জানি না, খান পঞ্চাশ বই লিখেছেন, হিন্দি সাহিত্যে বেশ বিখ্যাত নাম বলা যায়—তাঁর

বিরুদ্ধে মামলা। আমাকে ডিফেন্স-কৌঁসিলি হবার জন্য সেধেছিলো, আমি রাজি হইনি। রাজি হ'লো এক ছোকরা ব্যারিস্টার, টাটকা পাশ ক'রে ফিরেছে বিলেত থেকে—আপনারা যাকে বলেন সাহিত্যরসিক সেই ধরনের ছেলে—খুব ভালো আর্গু করেছিলো, কিন্তু আমি তাকে আগেই ব'লে দিয়েছিলাম যে এই মামলায় কনভিকশন হবেই।' 'কেন? হবেই কেন?' 'হবে এইজন্যে যে এ-পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি অবসিনিটি আর সিডিশনের মামলায় ডিফেনডেন্ট হেরে গেছে, সেটাই ইংরেজ আমল থেকে এ-দেশের ট্র্যাডিশন, অ্যাণ্ড দি ল অন অবসিনিটি—পীনাল কোডের দু-শো বিরানব্বুই আর দু-শো তিরানব্বুই নম্বর ধারা—যদি কখনো প'ড়ে দ্যাখেন—বড্ড ঝাপসা সেগুলো, অবসিনিটি ইজ় নট ঈভন্ ডিফাইণ্ড, পুরো ব্যাপারটাই জজসাহেবের মর্জির ওপর নির্ভর করছে। একটা মানুষ খুনের দায়ে সোপর্দ হ'লেও অনেক চান্স পায়—সাক্ষীর মূল্য আছে সেখানে, ফ্যাক্টগুলোকে গণ্য করা হয়, অ্যালাইবি প্রমাণ করতে পারলে তো কথাই নেই—কিন্তু অবসিনিটির মামলায় সাক্ষী-ফাক্ষী কোনো কাজেই লাগে না, কোনো এক্সটেন্যুয়েটিং এভিডেন্স বেরিয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই—জজ যদি অবসীন মনে করেন সেটাই শেষ কথা, দি কাউন্সেল স্পেণ্ডস হিজ় ব্রেথ ইন ভেইন। আর তাছাড়া—ইন দিস কেইস—পেছনে সব অন্য ব্যাপার ছিলো, মশাই, সার্টেন ফোর্সেজ় অ্যাট ওঅর্ক বেহাউণ্ড দি সীন—সব কথা খুলে বলা যাবে না আপনাকে, শুধু এটা বলতে পারি যে এভ্‌রিথিং ইজ় পলিটিক্স ইন সাম্ ওয়ে অর আদার। যা বলেছিলাম হ'লোও তা-ই—জজসাহেব ভেবে-চিন্তে খুব অল্প টাকা জরিমানা করলেন, হাইকোর্টে অ্যাপীল পর্যন্ত চললো না—বইটা মাঠে মারা গেলো।' 'কী ছিলো বইটাতে?' 'ছিলো—এই আজকাল যাকে ফ্রী লভ বলে তা-ই

আরকি। কোনো উটকো ছেলে-ছোকরার লেখা হ'লে তবু বা বুঝতাম, কিন্তু রামশরণের বয়স ষাট, বাপ ছিলেন কাশীর টোলে বেদান্ত-পড়া পণ্ডিত, খাঁটি কুলীন ব্রাহ্মণের ঘর, আর রামশরণও রামায়ণ বিষয়ে একজন অথরিটি ব'লে গণ্য—কোথায় তিনি দেশের যুবকদের বড়ো-বড়ো আদর্শের পথে চালিত করবেন, তা নয়তো এই বুড়ো বয়সে "উর্বশী" নাম দিয়ে নভেল লিখে নাম খারাপ করার কী-দরকার ছিলো তাঁর বলুন তো? রামশরণ যখন তাঁর টকটকে লাল গায়ের রং আর শাদা চুল নিয়ে, খদ্দরের ধুতি-চাদর আর হরিণের চামড়ার চটি প'রে কোর্টে এসে ঢুকলেন, আর একটা সেপাই তাঁর পিঠে গুঁতো দিয়ে তাঁকে কাঠগড়ার খাঁচায় দাঁড় করিয়ে দিলো—যেন তিনি ডাকাতির বা কোনো নারীধর্ষণের আসামি—তখন সত্যি আমার বড়ো লজ্জা করছিলো তাঁর জন্য।' 'আমারও খুব লজ্জা করছে, মিস্টর মুন্সি, কিন্তু রামশরণের জন্য নয়।' 'ও, আপনি আর্টের কথা ভাবছেন? তা আমরা কিছুদিন আর্ট ছাড়াও চালাতে পারবো হয়তো, কিন্তু দেশের উন্নতি এখনই হওয়া দরকার।' 'ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন—কিন্তু—আমার বড়ো তেষ্টা পেয়ে গেছে, মিস্টর মুন্সি, একটু জল—' গগনবরন তক্ষুনি হাঁক দিলেন, 'বাহাদুর! পানি পিলাও।' 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমাকে এক মিনিটের জন্য মাপ করুন—' বলতে-বলতে আমি সোজা উঠে পর্দা ঠেলে ভেতরে চ'লে এলাম, সেটা ভালো দেখাবে কি দেখাবে না সেই চিন্তা আমার মনের ধারে-কাছে কোথাও ঘেঁষতে পারলো না তখন।

পর্দার ওপিঠে একটা করিডর, দু-দিকে দুটো শোবার ঘর মনে হ'লো, আরো একটা ছোটো ঘর যার আধো-খোলা দরজা দিয়ে আমার চোখে পড়লো লেখার টেবিল, টেবিলের ওপর ছড়ানো বই কাগজপত্র, একটা টাইপরাইটার। আরো একটু এগিয়ে আর-একটা বারান্দা, তারপর

ছোট্ট একটু সব্জিখেত—সামনের বাগানে তখন ছায়া প'ড়ে গেছে, কিন্তু এ-দিকটা পশ্চিম ব'লে রোদ তখনও মিলোয়নি। আমার বাঁ দিকে একটা পর্দা-ঢাকা দরজা, ভেতর থেকে আসছে গরম ঘিয়ের গন্ধ আর নিচু গলায় কথাবার্তার আওয়াজ—এটাই রান্নাঘর নিশ্চয়ই, যে-জলের জন্য আমার তেষ্টা পেয়েছে তা এখানেই পাওয়া যাবে। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে আমি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম।

—এ কী হচ্ছে, ধীরাজ? তুমি তো নারীসঙ্গের অভাবে চুপসে-যাওয়া গাল-ভাঙা ব্রণ-ওঠা কোনো বঙ্গযুবক নও, তোমার বান্ধবীর অভাব নেই কলকাতায়, ইচ্ছে করলে দার্জিলিঙেও জুটিয়ে নিতে পারো দু-একটি—তুমি কেন নিজেকে ছোটো করছো এ-ভাবে? কেন হঠাৎ উঠে এলে গগনবরনকে ছেড়ে—তুমি, নিজে একজন লেখক, মুখে যতই বলো তুমি সাহিত্যের কিছুই বোঝো না, তোমার মাথার খুলিতে ছিটে-ফোঁটা ঘিলু নেই তা তো নয়—কেন তুমি গগনবরনকে 'ঠিক কথা, ঠিক কথা' ব'লে কাপুরুষের মতো পালিয়ে এলে? তোমার কি উচিত ছিলো না সাহিত্য বিষয়ে, অশ্লীলতা বিষয়ে গগনবরনের কথাগুলোর প্রতিবাদ করা, অন্তত এই কথাটা বলা যে সাহিত্যিকের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হ'লে তাকে 'দেশের উন্নতি' বলা যায় না, বরং তাতে দেশকে আরো নামিয়ে দেয়া হয়? এমনকি আইনজ্ঞের মুখের ওপর তুমি এ-কথাটাও ছুঁড়ে মারতে পারতে যে অশ্লীলতার আইনটাই বেআইনি, কেননা তা আমাদের ফাণ্ডামেণ্ট্‌ল্‌ রাইট্‌স-এর সঙ্গে মেলে না। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারতাম, ও-সব বলা উচিত ছিলো আমার—কিন্তু উনি এমন তোড়ে কথা বলছিলেন, আর আমার শুনতে-শুনতে এমন ক্লান্ত লাগছিলো, মনে হচ্ছিলো উনি ওঁর মত নিয়ে থাকুন না—কী এসে যায়? ঐ তো, মানুষটা বড্ড কুঁড়ে তুমি, যা-কিছু একটু কঠিন তা-ই এড়িয়ে চ'লে যাও,

শুধু সহজ আমোদ নিয়ে মেতে থাকতে চাও, আর তাই এখন এক অচেনা বাড়ির রান্নাঘরের বাইরে ঘুরঘুর করছো! যদি হঠাৎ কোনো ঘর থেকে মৃণালিনী বেরিয়ে আসেন, বা ঐ বাহাত্তুর ছোকরার মুখোমুখি প'ড়ে যাও—কী করবে তা'হলে? কী বলবে? থাক, তাহ'লে—ফিরে যাই গগনবরনের কাছে, গিয়ে গম্ভীর গলায় বলি, 'আমার একটা কথা মনে হয়, মিস্টার মুন্সি—' কিন্তু কী মনে হয়, সাহিত্যের মূল্য বিষয়ে কী আমি বলতে চাই তাঁকে, তা আমি ভেবে পেলাম না সে-মুহূর্তে—হঠাৎ, প্রায় নিজেরই অজান্তে, পর্দা ঠেলে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লাম।

পশ্চিমের জানলার কাচে জ্বলজ্বল করছে সূর্যাস্তের আলো, ইলেকট্রিক আলো ছাপিয়ে সেই আভায় রঙিন হ'য়ে আছে ঘরটি। গ্যাসের উনুন জ্বলছে, নিচু তাপে চায়ের কেটলি চাপানো—লম্বা টেবিলে ছুরি দিয়ে আলু কাটছে অবন্তী, একটি রেকাবিতে পেস্তা কিশমিশ সাজানো, চটপট আলু আর মটরশুঁটি সেদ্ধ ক'রে শিঙাড়ায় পুর ভরছে রুক্মি—কয়েকটা ভাজা হ'য়ে গিয়ে সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়ছে, অন্যগুলো ঘিয়ে প'ড়ে ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ করছে, রুক্মি খুন্তি দিয়ে উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে তাদের। অবন্তী বললো, 'দ্যাখো তো, আরো সরু করবো কিনা, চাও তো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাওয়াতে পারি তোমাকে।' 'ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কে চাচ্ছে তোমার কাছে? বললাম চাক-চাক ক'রে কাটো!' 'চাক-চাক ক'রে কাটতে সবাই পারে, সরু ক'রে কাটতে ওস্তাদি দরকার।' 'আপাতত তোমার ওস্তাদির চাইতে শিঙাড়ার দরকার অনেক বেশি—এই সেদ্ধ আলু-গুলোতে গোলমরিচ ছিটিয়ে দাও তো।' 'না কি কাঁচা লঙ্কার কুচি মিশিয়ে দেবো—একটা নতুন ধরনের গন্ধ হবে তাতে।' 'কী সর্বনাশ! ব্যারিস্টার সাহেব একদম ঝাল খেতে পারেন না জানো না? তুমি বরং স'রে যাও এখান থেকে—আমি তোমার জন্য লঙ্কাগুঁড়ো

মেশানো মুড়ি নিয়ে আসছি।' কিছুমাত্র অপ্রতিভ না-হ'য়ে অবন্তী বললো, 'ঐ যে তোমার কেটলির বাঁশি বেজে উঠলো—তুমি চা করো, আমি শিঙাড়াগুলো ভেজে ফেলি।' 'আঃ, তুমি বড্ড সর্দার, অবন্তী! যা বলছি তা-ই করো না কেন?' এতগুলো কথার মধ্যেও ওরা লক্ষ করলো না আমাকে—ওদের পিঠ আমার দিকে ফেরানো ছিলো—আমার ভারি অস্বস্তি লাগলো, মনে হ'লো যেন গোয়েন্দাগিরি করছি, তাই একবার জুতো ঘষলাম মেঝেতে। 'আরে ধীরাজ-দা, এসো এসো, একটা গরম শিঙাড়া চাখবে নাকি?' ব'লে আমার সামনে রুক্মি একটা প্লেট ধরলো। 'এই যে, এই চেয়ারটাতে ব'সে নাও বরং।' 'আমার ভাগেরটা রেখে দাও, আমি একটু ঘুরে আসছি।' 'ঘুরে আসছো? কোত্থেকে?' 'আসছি এক্ষুনি—' আর দেরি না-ক'রে ওদের সব্জি-খেতে নেমে এলাম আমি, খিড়কির ছোট্ট ফটক দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম হনহন ক'রে। হোটেলে ফিরে গোবিন্দবাবু ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তাস পেটালাম রাত্তির ন-টা পর্যন্ত, মনে-মনে বললাম, 'ধুত্তোর রুক্মি! যত বাজে!'

৫

সে-রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম আমি ধরমতলার কাপ্রি কাফেতে ব'সে আছি। সব সুদ্ধ, জন দশেক আমরা—সাহিত্যিক আর সাহিত্যিকের লেজুড় দু-একজন, তিনটে মেয়েও জুটে গেছে দলে, আর আছে শশাঙ্ক পাল, হ্যালহেলে ঢ্যাঙা চেহারা, পান খেয়ে-খেয়ে বড়ো-বড়ো দাঁতগুলো লাল হ'য়ে থাকে সারাক্ষণ, কিন্তু তার একটা গুণ এই যে কথাবার্তা খুব কম বলে, শুধু ভক্তিভরে শোনে আমাদের সব হাসিঠাট্টা গল্পগুজব, আর মাঝে-মাঝে পুরো মুখটা হাঁ ক'রে খুলে টিনের মতো শব্দে হেসে ওঠে। তাছাড়া আরো একটা গুণ আছে শশাঙ্কর তার ব্যাগ-ভর্তি একশো টাকার নোট থাকে সারাক্ষণ, বম্বের কোন প্লাস্টিক কোম্পানির কলকাতার সোল এজেন্ট সে, আমরা দয়া ক'রে বিল্ চোকাবার ভারটা তারই ওপর ছেড়ে দিই, সে তার জন্য হেঁ-হেঁ শব্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করে। আমরা খাচ্ছি স্কচ, প্লেটের পর প্লেট চিংড়ি-কাটলেট আর মুর্গি-রোস্ট ঘুরে যাচ্ছে—মেয়ে তিনটের মধ্যে তুটো আমার তু-পাশের চেয়ার দখল করেছে, কুচ্ছিৎ তারা, একজন 'রবীন্দ্রনাথ'কে বলে 'রবীন্দনাথ', আর-একজন আমাকে ধ'রে তার কবিতা ছাপাতে চায় কোনো কাগজে,—কিন্তু মদের চাট হিশেবে আমার নেহাৎ মন্দ লাগছে না তাদের। এক সময় আমি যখন কবিতা-লিখুনি মেয়েটার মুখের কাছে মুখ নিয়ে ঠোঁট গোল ক'রে বলেছি, 'কী, রাজি আছো?' আর মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খিলখিল শব্দে হেসে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে জেগে উঠে দেখলাম আমি হিমানী হোটেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি—মনটা ব্যাজার হ'য়ে গেলো।

কিন্তু স্নান ক'রে, ডবল-ডিমের অমলেট আর মাছের বড়া আর মোহনভোগের 'স্পেশল ব্রেকফাস্ট' খেয়ে, শার্টের ওপর টকটকে লাল সোয়েটার চাপিয়ে আমি যখন রাস্তায় বেরোলাম, আমার পা তুটো যেন আমার অজান্তেই চন্দ্রকোণার দিকে ঘুরে যেতে চাইলো। নিজেকে ধমক দিয়ে বললাম, 'না—কখ্খনো না। আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে ছাড়বো আমি তার ওপর একটুও নির্ভর করছি না—সে সুখে থাক তার স্বামীর জন্য শিঙাড়া ভেজে আর বাল্যবন্ধুর সঙ্গে গালগল্প ক'রে, আমি কানাকড়িও পরোয়া করি না তার জন্য। কালকের রান্নাঘরের দৃশ্যটা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে—এ-কথা তাহ'লে ঠিক নয় যে অবন্তী 'বড্ড লাজুক,' গুরুগম্ভীর বিষয়ে ছাড়া কথা বলতে পারে না, দেখা গেলো যে ঠিকমতো রোদ-জল পেলে তার মাচাতেও ফুল ধরে তু-একটা। আর রুক্মি—সেও একেবারে সরলা বালিকা নয়, স্বামীর ঘরে গিয়ে সে যত না রান্নায় পটু হ'য়ে থাক, তার মধ্যেও আছে সেই চিরন্তনী নারী, যে চায় কোনো পাশের লোকের ওপর প্রভুত্ব,

মহাপণ্ডিত অবন্তীকে ভৃত্যের মতো খাটিয়ে যে আনন্দ পায়—অবশ্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রেখে। বেচারা অবন্তী—ঐ কোণের ঘরে ব'সে ব'সে শক্ত-শক্ত বই পড়ে সারাদিন, টাইপরাইটার নিয়ে কী যে লেখে তার মাথামুণ্ডু নেই, রোগা ছোটোখাটো মানুষ, জমকালো গগনবরনের পাশে তাকে পুরোপুরি একটা পুরুষ ব'লেই মনে হয় না—তার ডাক পড়ে শুধু শিঙাড়া ভাজায় সাহায্য করতে (রুক্‌মির হুকুমে উল বুনতেও শিখেছে হয়তো !)—নারীত্বের এই ঝ'রে-পড়া বিলিয়ে-দেয়া সুবাসটুকু নিয়েই তাকে খুশি থাকতে হয়। কিন্তু আমার চাহিদা আরো বড়ো—রুক্‌মিকে দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই।

আমি আস্তে-আস্তে হেঁটে চৌরাস্তায় এলাম, দার্জিলিঙের লোকেরা যাকে বলে 'ম্যাল রাউণ্ড' দেয়া, সেই কর্তব্যটি সম্পন্ন করলাম। আজ আকাশ খুব পরিষ্কার, উত্তর জুড়ে সবগুলো বরফের পাহাড় বেরিয়ে পড়েছে, এ-রকম দিন (হোটেল থেকে বেরোবার আগে গোবিন্দবাবু বলেছিলেন আমাকে)—এ-রকম দিন গ্রীষ্মকালে বেশি পাওয়া যায় না ; বোধহয় সেইজন্যই ম্যাল-এ আজ ভিড় কিছু বেশি—বা কলকাতায় কলেজগুলো ছুটি হবার জন্য আরো অনেক লোক চ'লে এসেছে—আর সেই ভিড়ের মধ্যে—বাবারে বাবা, মেয়ের মিছিল, মেয়ের দঙ্গল, যেন বালিগঞ্জ উজোড় ক'রে সব চ'লে এসেছে এখানে—রং-বেরঙের হরেক ফ্যাশনের শাড়িতে যেন ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়েছে। আমি চৌরাস্তায় ফিরে একটি বেঞ্চিতে ব'সে এই শোভাবাজার দেখতে লাগলাম, আমার মনের মধ্যে একটা নতুন ভাবনা খেলা ক'রে গেলো।

আমি যেখানে ব'সে আছি তার সামনে একটি ভুটানি দম্পতি গাছের ছায়ায় সতরঞ্চি পেতে দোকান খুলে বসেছে। একগাদা গয়না আর টুকিটাকি জিনিশ—সবই বাজে মাল নিশ্চয়ই—কিন্তু তাই ব'লে মেয়েরা

ভিড় করছে না তা নয়, তারা খুঁটে-খুঁটে দেখছে সেগুলো, দরদস্তুর করছে, কেউ-কেউ দু-একটা কিনেও নিচ্ছে দেখছি। এইমাত্র দুটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো—একটি ফর্শা, অন্যটি কালো, আমি আর-একবার তাকিয়ে চিনতে পারলাম তাদের, কয়েকদিন আগে এই চৌরাস্তাতেই তারা গায়ে প'ড়ে আলাপ ক'রে গিয়েছিলো আমার সঙ্গে।

আমি উঠে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালাম।

নিচু হ'য়ে গয়না দেখছিলো ওরা, ফর্শা মেয়েটি সোজা হ'য়ে উঠে আমাকে দেখতে পেলো। 'সে কী! আপনি!' ব'লেই বুঝলো, অতটা অবাক-হওয়া ভাব দেখানো ঠিক হয়নি তার, ঈষৎ লাল হ'লো। আমি তার লজ্জার সুযোগ নিয়ে বললাম, 'কেন? আমি কি এখানে আসতে পারি না?' 'নিশ্চয়ই পারেন—' কালো মেয়েটি কটাক্ষ করলো এবার—'কিন্তু আপনাকে আমরা এ-ক'দিন দেখিনি তো, ভাবলাম চ'লে গেলেন বুঝি।' 'আমিও খুঁজেছি তোমাদের—দেখা পাইনি।' ফর্শা মেয়টি মাথা নেড়ে ব'লে উঠলো, 'এটা ঠিক কথা নয়—একদম বানানো।' 'আমার মনের কথাও জানো দেখি তোমরা। বলো তো এখানে কেন এসে দাঁড়িয়েছি?' 'আমাদের জন্য নিশ্চয়ই নয়,' কালো মেয়েটির চোখে কৌতুকের ঝিলিক দিলো, 'কিছু কিনবেন বোধ-হয়?' 'দুটোই সত্য—আমি একটা মালা কিনতে চাই, আর এও চাই যে তোমরা সেটা পছন্দ ক'রে দেবে, দাম ঠিক ক'রে দেবে। আমি আবার দরদস্তুর করতে একদম পারি না।' 'দেবো,' কালো মেয়েটি জবাব দিলো তক্ষুনি, 'যদি বলেন কার জন্য কিনছেন।' 'এবং সেই মানুষটির একটা বর্ণনাও দিতে হবে, রোগা না দোহারা গড়ন, গায়ের রং কেমন, কোন ধরনের সাজগোজ পছন্দ করে—এ-সব না-জানলে মালা পছন্দ করা যায় নাকি?' ফর্শা মেয়েটি এ-কথা বলামাত্র দুই সখী চোখোচোখি

ক'রে হেসে উঠলো। আমি বললাম, 'আমি বুঝতে পারছি ঠাট্টাটা আমাকে নিয়েই—তবু ব'লে ফ্যালো, আমিও সেটা উপভোগ করি।' আর-এক দমক হাসির পর কালো মেয়েটি বললো, 'আমি আর চন্দনা একটা বাজি রেখেছিলাম, জানেন—' 'তোমার নাম চন্দনা বুঝি? আর তোমার?' 'আমার নাম কৃষ্ণকলি—বুঝতে পারছেন, গায়ের রং লক্ষ ক'রে রাখা হয়েছিলো।' আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ—হরিণ-চোখও আছে, বেশ মানিয়ে গেছে নামটা।' 'কী যে বলেন—ও-সব কাব্যি-কথার কোনো মানেই হয় না!' আমি লক্ষ করলাম কৃষ্ণকলির মুখে একটি হালকা সুখের আভা ছড়িয়ে পড়লো, সে চেষ্টা ক'রেও চাপতে পারলো না সেটা, একটা কাঁসার পুতুল তুলে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগলো। আমি বললাম, 'তা বাজিটা কী নিয়ে জানতে পারি? চাপা হাসির শব্দের সঙ্গে চন্দনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'আপনি বিয়ে করেছেন কিনা—' আর কৃষ্ণকলি ভুরু বাঁকিয়ে ব'লে উঠলো, 'আঃ, ব'লে দিলি! সব কথা সকলকে বলতে নেই জানিস না?' 'ব'লে ভালোই করলে, চন্দনা—আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে পারলাম যে আমার স্ত্রী যদি বা কোথাও থেকে থাকে তার সঙ্গে আমার এখনো শুভদৃষ্টি হয়নি।' 'দেখলি তো!' ছোট্ট তালি দিয়ে কৃষ্ণকলি ব'লে উঠলো, 'আমি বলেছিলাম না উনি বিয়ে ক'রে থাকলে নিশ্চয়ই স্ত্রীকে নিয়েই আসতেন এখানে—একা-একা ঘুরে বেড়াতেন না!' 'তাহ'লে মালা কিনছেন কার জন্য?' আমি বললাম, 'কেন? একটিমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কি কেউ থাকতে নেই?' আমার কথা শুনে চন্দনা একটু গম্ভীর হ'লো, আর কৃষ্ণকলি চোখ টান ক'রে বললো, 'তা আপনার কথা আপনিই জানেন—কিন্তু সত্যি মালা কিনবেন তো অজন্তা জুয়েলারিতে চলুন—এখানে কিছু ভালো নেই।'

'এখন থাক, মালা আর-একদিন কেনা যাবে, এসো একটু বসি এখানটায়।'

মেয়ে ছুটির সঙ্গে হাসিঠাট্টায় আমোদে বেলা এগারোটা অবধি কাটিয়ে দিলাম সেদিন, আমার মনের তেতো ভাবটা একদম কেটে গেলো, এরা ছু-জনে যেন আস্তে-আস্তে রুক্‌মিকে সরিয়ে দিলো আমার মন থেকে, ভারি একটা আরাম অনুভব করলাম। এবং এও বুঝে নিলাম যে এ-পালা আজকেই শেষ হবার কোনো দরকার নেই, আমি ইচ্ছে করলেই এটা চালিয়ে যেতে পারি আর যে-কটা দিন দার্জিলিঙে আছি। কিন্তু মুশকিল এই যে এরা সংখ্যায় ছুই, আর এ-রকম ক্ষেত্রে একই আমার পছন্দ। কিন্তু কোনজন? এদের ছু-জনকেই রসিকা ব'লে মনে হয়, কথাবার্তায় ছু-জনেই বেশ চটপটে কিন্তু কৃষ্ণকলির ঝাঁঝ যেন বেশি, তার চোখ অনেক বেশি নাচে এবং হাসে, আমরা যাকে 'খেলুড়ি মেয়ে' ব'লে থাকি সে সেই জাতের হ'লেও হ'তে পারে। ওদের ছু-জনের একই দিকে বাড়ি; আমি ওদের সঙ্গে খানিকটা পথ হাঁটতে-হাঁটতে সিগারেট ধরাবার অছিলা ক'রে থেমে গেলাম। তিন-চারটে দেশলাইয়ের কাঠি নিবিয়ে দিলাম ফুঁ দিয়ে সেটুকু সময়ে চন্দনা খানিকটা এগিয়ে গেলো, কৃষ্ণকলি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাকে দিন, আমি খুব ভালো দেশলাই ধরাতে পারি।' আমি বললাম, 'চৌরাস্তা প'চে গেছে, এত ভিড় আর ভালো লাগে না, আমি একটা চমৎকার নিরিবিলি স্পট খুঁজে পেয়েছি, তিব্বতি ক্যাম্পের কাছে একটা হাওয়া-ঘর।' 'হ্যাঁ, দেখেছি—চৌরাস্তা থেকে উত্তরে তো?' 'ঠিক ধরেছো—কাল দশটা নাগাদ—কেমন?' 'তা বেশ, বলেন তো আসতে পারি,' একটু উদাস গলায় জবাব দিলো কৃষ্ণকলি। আমি নিচু গলায় বললাম, 'একা এসো।' মুহূর্তকাল থমকে চোখ দিয়ে সম্মতি জানালো

সে, তারপর ছুটে যেতে-যেতে বললো, 'এই চন্দনা—দাঁড়া, দাঁড়া, একটা কথা আছে শোন।' এর পর ওদের সঙ্গে যেটুকু সময় রইলাম, কৃষ্ণকলি আমাকে তেমন আমল দিলো না, সারাক্ষণ সখীর সঙ্গেই আমার অজানা সব বিষয় নিয়ে কথা বললো, আর চন্দনা বার-বার চেষ্টা করতে লাগলো আমাকে তাদের আলাপের মধ্যে টানতে। আমি নিশ্বাস ছেড়ে মনে-মনে বললাম, 'যাক, আর চন্দ্রকোণার দিকে পা বাড়াতে হবে না।'

কিন্তু পরদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে এক কাণ্ড। পোস্টাপিশ পেরিয়ে মোড় গিয়েছি, হঠাৎ কানে এলো—'ধীরাজ-দা!' ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই উনতিরিশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে রুক্মি নেমে আসছে। আমি অপেক্ষা না-ক'রে পারলাম না, মিনিটখানেকের মধ্যে সে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

'অদ্ভুত তুমি! সেদিন ও-রকম হুট ক'রে চ'লে গেলে—আমরা রাত ন-টা অবধি ভাবছি তুমি এই এলে বুঝি—আর তোমার কিনা পাত্তাই নেই! কী হয়েছিলো?' 'হ'লো কী জানো,' আমি খুব তাড়াতাড়ি বলতে লাগলাম, 'আমার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো যে ছ-টার সময় একজনের দেখা করতে আমার কথা আমার সঙ্গে, তাই হোটেলে ফিরে এলাম—কিন্তু লোকটাও এলো না; তার জন্যে ব'সে থেকে-থেকে রাতও হ'য়ে গেলো।' আমার ভয় ছিলো রুক্মি না জিগেস ক'রে লোকটি কে, তখন আবার আর-একটা মিথ্যে বানাতে হবে আমাকে—আর যদিও মা দাদা বৌদির কাছে আমি অনেক সত্য গোপন ক'রে থাকি। তবু নির্জলা মিথ্যেটা বলতে আমার বাধে এখনো—কিন্তু রুক্মি খুব সহজেই আমার জবাবদিহি মেনে নিয়ে বললো, 'খুব অন্যায় এ-রকম কথা দিয়ে কথা না-রাখা—তা তুমি ইচ্ছে করলে রাত ক'রেও আসতে

পারতে। তুমি চা না-খেয়ে চ'লে গেছো শুনে মা বকলেন আমাকে—"ওকে যেতে দিলি কেন? একেবারে সামনের চা ফেলে চ'লে গেলো!" মা যেন কেমন—যেন জোর ক'রে কেউ কাউকে ধ'রে রাখতে পারে।' আমি ঐ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'তুমি কোনদিকে?' 'আমি বাজারে যাচ্ছি।' 'হঠাৎ বাজারে?' 'হঠাৎ নয়—দরকার আছে।' 'একা?' 'বা রে, বাজারে যেতে আবার সঙ্গীর দরকার হয় নাকি?' একটু চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম, 'অবন্তীবাবু কী করছেন?' 'আজ সকাল থেকেই ওর ঘরে টাইপরাইটারের খটাখট শুনছি—দরজা ভেজানো, প্রবেশ নিষেধ।' 'তা তুমি বললে চ'লে আসতো হয়তো?' আমি আড়চোখে রুক্‌মির দিকে তাকালাম, সে ঠোঁটের কোণে হাসলো। 'আমি অমন অন্যায় কথা বলবো কেন, ধীরাজ-দা, ও নিজের কাজ করছে—কাজ করুক। তাছাড়া, ওর পায়ে একটু জখম আছে তো, উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথে বেশিক্ষণ চলতে ওর অসুবিধে হয়—যদিও সে-কথা প্রকাশ করে না কখনো। তুমি চলো না আমার সঙ্গে বাজারে।' 'আমার পা দুটো মজবুত আছে তা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু আমি এখন—' হঠাৎ একটা নতুন আইডিয়া খেলে গেলো আমার মাথায়; বললাম, 'আমি বেরিয়েছিলাম সিগারেট কিনতে, এক্ষুনি হোটেলে ফিরে যাবো। আমি একটা গল্প লিখতে শুরু করেছি।' এই মিথ্যেটা খুব সহজে বেরিয়ে এলো আমার মুখ দিয়ে, সত্যি বলতে সেটা মিথ্যে ব'লেও আমার মনে হ'লো না—হঠাৎ, সেই মুহূর্তে, সেই পোস্টাপিশের মোড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার খুব ইচ্ছে হ'লো ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কিছু লিখতে ব'সে যাই—আমি মাথা নিচু ক'রে কাগজের ওপর কলম চালিয়ে যাচ্ছি, এই দৃশ্যটা কল্পনা করতে খুব ভালো লাগলো। আমারও কিছু কাজ আছে, আমার কাজটাও ফ্যালনা হয় নেহাৎ, রুক্‌মি

যেন না ভাবে যে তার সঙ্গী হ'য়ে বাজারে যাবার সময় অন্য কারো নেই, শুধু আমারই আছে।

'গল্প লিখছো? বাঃ! এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হ'তে পারে। তা খানিকটা পথ একই দিকে পড়ছে আমাদের, সেটুকু এসো একসঙ্গে হাঁটি।'

আমি আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখন সওয়া-ন'টা মাত্র, রুক্মিকে বাজারের মোড়ে বিদায় দিয়েও যথেষ্ট সময় হাতে থাকে আমার। আমি সত্যি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি, সেটা দেখাবার জন্য ওর সঙ্গে খানিকটা পথ হাঁটতেই হ'লো।

বাজারের রাস্তাটা যেখানে চালু হ'য়ে নেমে গেছে সেই মোড়ে এসে রুক্মি বললো, 'আচ্ছা, চলি। তুমি লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছো, নয়তো একবার আসতে বলতাম তোমাকে। আমার স্বামী আজ চ'লে যাচ্ছেন, তিনি বলছিলেন তোমার কথা।' 'ও, হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম—খুব চেষ্টা করবো, কখন বেরোচ্ছেন তিনি?' 'তিনি এখান থেকে ছাড়ছেন বেলা তিনটেতে। যদি তোমার সময় হয়—' 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! সেদিন তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে খুব ভালো লেগেছিলো আমার—চমৎকার স্বামী পেয়েছো, রুক্মি!' 'এ-সব বুড়োটে কথা তোমার মুখে মানায় না,' ব'লে হালকা হাসলো রুক্মি, তার চোখ দুটি খুব শান্ত হ'য়ে আমার চোখের ওপর এসে পড়লো। আমার হঠাৎ মনে হ'লো সেদিন আমার সত্যি একটু অভদ্রতা হ'য়ে গিয়েছিলো গগনবরনের কথার মধ্যিখানে উঠে গিয়ে, রান্নাঘরে রুক্মির অভ্যর্থনাকে উড়িয়ে দিয়ে ও-ভাবে চ'লে আসাটা আমার ঠিক হয়নি—ও-রকম কড়া মেজাজের মানুষ আমি তো নই আসলে, বরং আমার ঢিলেঢোলা স্বভাব নিয়ে আমি উপরোধে অনেক ঢেঁকি গিলে থাকি। সেই ঘটনার ক্ষতিপূরণ করার

একটা সুযোগ আমি দেখতে পেলাম যে-মুহূর্তে—ব'লে উঠলাম, 'চলো যাই একটু ঘুরে আসি তোমার সঙ্গে, কয়েকটা মিনিটে আর কী ক্ষতি হবে।'

সব্জি-বাজার ঘুরতে-ঘুরতে আমি রুক্মির দিকে তাকালাম। তাকে একটু চিন্তিত দেখালো।

'কী খুঁজছো, রুক্মি? কী কিনবে?'

'আমার স্বামীর সঙ্গে কিছু মাশ্‌রুম দিয়ে দেবো ভেবেছিলাম—পাচ্ছি না।'

'ওদিকে তো ফেলে এলাম মাশ্‌রুম।'

'ওগুলো নয়—একটা অন্য জাত আছে, দেখতে কালচে-মতো গোল-গোল, গাছের গায়ে জন্মায়। এখন ঠিক সীজ়ন নয় অবশ্য, অক্টোবরে ওঠে। ওদিকটায় ঘুরে দেখি একবার—যদি পাওয়া যায়।'

অবশেষে সেই বিখ্যাত গেছো ব্যাঙের-ছাতা পাওয়া গেলো, হাসি ফুটলো রুক্মির মুখে। দোকানে যতটা ছিলো সব কিনে নিয়ে বললো, 'আমি রেখে দেবো খানিকটা, তুমি যেদিন আসবে রেঁধে খাওয়াবো।' 'খুবই লোভনীয় প্রস্তাব—কিন্তু এখন—এখন আমাকে যেতে হচ্ছে, রুক্মি।' সে-মুহূর্তে আমার ভাবতে খুব ভালো লাগলো আমার জন্য এক মাইল দূরে একটি মেয়ে অপেক্ষা করছে—এবং সে রুক্মি নয়। নির্জন হাওয়া-ঘরে ব'সে কৃষ্ণকলির সঙ্গে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলাম সেদিন।

৬

হঠাৎ ঋতু-বদল হ'লো দার্জিলিঙে। সকাল থেকে এপ্রিল মাস ব্যাজার, ঝেঁকে-ঝেঁকে বৃষ্টি আর আকাশ যেন পাৎলা মেঘের সিসে দিয়ে মোড়া— একটা ভেজা শীত জাপটে ধরছে পৃথিবীটাকে—বিশ্রী! আমি ঘুম ভাঙার পরেও শুয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ, চৌরাস্তায় গিয়ে রং-বেরং ভিড় দেখতে পাইনি—যেন হাট ভেঙে গেছে এমনি চেহারা। আমার বিরক্ত লাগছে, হিমানী হোটেলের ঘরের মধ্যে ব'সে-ব'সে বোকার মতো লাগছে নিজেকে—কেন বা এসেছিলাম কলকাতার আড্ডা ফেলে একলা, একা-একা হুইস্কি-জিন-রাম্-এও কোনো সুখ নেই, কেনই বা ফিরে যাচ্ছি না এখনো, চোদ্দটা দিন কাটিয়ে দিলাম আর হিমালয়-দৃশ্যের পক্ষে এ-ই যথেষ্ট! ইচ্ছে করলে আজকেও কলকাতা-মুখো প্লেন বা ট্রেন ধরতে পারি, কিন্তু সেটুকু নড়াচড়া করার মতো উৎসাহও

জোটাতে পারছি না—আর তাছাড়া ঐ কৃষ্ণকলি মেয়েটার আজ আসার কথা আছে আমার হোটেলে—বেলা দেড়টা-দুটো নাগাদ। কাল বিকেলে যখন তার সঙ্গে বেড়াচ্ছি (অনেক কৌশল ক'রে তার সখীকে সে এড়িয়ে যাচ্ছে এ-কয়দিন), সে হঠাৎ ভুরু বাঁকিয়ে আমাকে জিগেস করেছিলো, 'আপনি আমাকে "তুমি" বলেন কেন ?' 'আমার ও-রকমই অভ্যেস, কিন্তু তোমার যদি আপত্তি থাকে—' আমার কথার মধ্যেই সে ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে ?' 'তাহ'লে তুমিও আমাকে "তুমি" বলতে থাকো—ল্যাঠা চুকে যাবে।' 'আমি অমন হুট ক'রে "তুমি" বলতে পারি না।' 'যদি ধরো তোমার পাতানো বিয়ে হয় তাহ'লে তো একজন অচেনা ভদ্রলোককে তুমি প্রথম রাত্রেই "তুমি" বলবে, বলবে কিনা বলো !' সে একটা কটাক্ষ করলো আমার দিকে, আমি শিভালরাস ধরনে তার হাতে চুমু খেলাম, তারপর আর-একটু ঘনিষ্ঠভাবে তার ঘাড়ের ওপর ঠোঁট ছোঁওয়ালাম। 'আঃ—করছেন কী ! চারদিকে লোক !' 'তাহ'লে একদিন চ'লে এসো না আমার হোটেলে—রাজি ?'

কিন্তু কালকের রোদ্দুর-মাখা বিকেলে চৌরাস্তার বেঞ্চিতে ব'সে যা মনে হয়েছিলো দিব্যি মজাদার, এই মেজাজ-বিগড়োনো স্যাঁৎসেঁতে দিনে সেই ব্যাপারটাকেও ময়লা আর বাসি ব'লে মনে হ'লো। কৃষ্ণকলি এলে সত্যি কি কোনো সুখ হবে আমার ? কী-লাভ ও-সব খুনসুটিপনায়, ছেলেমানষিতে ? না কি একটা ফ্যাশাদ বাধিয়ে আমাকে বাকি জন্মের মতো আঁচলে বেঁধে ফেলা তার মৎলব—তার মুখে অনেকবার শুনেছি যে তার জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে চারদিকে, কিন্তু পাতানো বিয়ে তার মনে হয় ঘেন্নার ব্যাপার। না, না—অত বোকা নই আমি, ইচ্ছে করলে কেটে পড়তে পারি এখনই, এই মুহূর্তে। তবু— সে আসবে ভাবতে ঈষৎ উত্তেজনা অনুভব করছি, আমার স্নায়ুগুলো আমাকে উশকে দিচ্ছে

মাঝে-মাঝে—আমি একটু সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে তৈরি হ'য়ে আছি তার জন্য, আর বাইরে তেমনি বৃষ্টি পড়ছে ঝেঁকে-ঝেঁকে, সারা আকাশ ছাইরঙা মেঘে মোড়া। আমি কয়েকটা পুরোনো পূজা-সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি (গোবিন্দবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন)—প্রায় সবগুলোতেই আমার লেখা আছে, কিন্তু সেই হলদে-হ'য়ে-যাওয়া কাগজের উপর ঘষা-ঘষা অক্ষরগুলো আমার মনটাকে একটুও টানতে পারছে না, ঘড়ির কাঁটায় বেলা দুটো পেরিয়ে যাওয়ামাত্র আমি উশখুশ করছি, কৃষ্ণকলি এলে পরে তাকে দেরি করার জন্য কী-রকম রূঢ় কথা শোনাবো তারই রিহার্সেল দিচ্ছি মনে-মনে। যখন ঘড়িতে দেখলাম আড়াইটে, তখন অগত্যা খুলে বসলাম একখানা আগাথা ক্রিস্টি (অগতির গতি এই ভদ্রমহিলা!), আর অল্পক্ষণের মধ্যেই জুম ধ'রে গেলো গল্পটায়, আমি অন্য সব ভুলে এক অজানা হত্যাকারীর পেছনে ছুটতে লাগলাম। হঠাৎ দরজায় টুকটুক টোকা পড়লো।

আমি লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম। আমার গলা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো আওয়াজ—'সে কী! তুমি!'

হালকা পায়ে ঘরে এলো রুক্মি, হাতের ছাতাটা দরজার কোণে রাখলো, খুলে দিলো মাছরাঙা-নীল বর্ষাতির বোতামগুলো—এক ঝলক আলোর মতো লাগলো আমার, বর্ষাতির তলায় তার আঁটো, লাল ব্লাউজটার দিকে তাকিয়ে। কয়েক মুহূর্ত আমি তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না।

'বড্ড যেন অবাক হ'য়ে গেছো আমাকে দেখে?' আমি জবাব দিলাম না, রুক্মি বেতের চেয়ারটায় ব'সে হালকা গলায় বললো, 'অদ্ভুত লোক! একবার আমাদের খোঁজ-খবর নিতে নেই? এ-ক'দিন করছিলে কী?' আমার মুখে এসেছিলো, 'কেন, চন্দ্রকোণায় যাওয়া

ছাড়া আর-কিছু করার নেই আমার ?'—কিন্তু সেটাকে চেপে দিয়ে ঠাণ্ডা ভদ্রতার সুরে বললাম, 'তোমরা ভালো আছো সবাই ?' 'আমরা ভালো আছি, কিন্তু বুড্ঢা—মানে আমাদের কুকুরটি, সে একদিন জ্বর বাধিয়ে ভারি ভাবনায় ফেলেছিলো আমাদের।' 'অবন্তীবাবু কি আজও টাইপরাইটার নিয়ে ব্যস্ত ?' 'অবন্তী চ'লে গেলো আজ—আমি তাকে এক্ষুনি ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম।'

কথাটা শোনামাত্র আমার মনের ভেতরটা কুঁকড়ে গেলো। ও, তাই! স্বামী তাঁর ব্যাঙের-ছাতার রসদ নিয়ে পাটনায় ফিরে গেছেন, অবন্তীও আর হাতের কাছে নেই, তাই আমাকে মনে পড়েছে শ্রীমতীর! ঈষৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে বললাম, 'তাহ'লে বড্ড একা প'ড়ে গেলে দেখছি।' —কিন্তু কথাটার ব্যঙ্গ যেন ছুঁতেই পারলো না রুক্মিকে, সে সরল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি ভাবছিলাম আজ একবার অর্কিড-হাউসে ঘুরে আসবো। তুমি যাবে ?' আমার রাগ হ'লো তার এই ভালোমানুষ-গোছের কথাটা শুনে, সংক্ষেপে জবাব দিলাম, 'আমার সময় নেই।' 'তুমি অর্কিড ভালোবাসো না ?' 'অর্কিড কাকে বলে তা-ই জানি না আমি।' 'তাহ'লে চলো জেনে নেবে—নেপাল থেকে অনেক নতুন নমুনা এসেছে শুনলাম।' 'তোমার কি মাথা-খারাপ ? এ-রকম বাদলার দিনে কেউ বেরোয়!' 'আমার ভালোই লাগে এ-রকম দিনে ঘুরে বেড়াতে—তুমি যদি নেহাৎ না যাও আমি বরং একাই ঘুরে আসি। অর্কিড-হাউস সাড়ে-পাঁচটায় বন্ধ হ'য়ে যায়,' বলতে-বলতে রুক্মি উঠে দাঁড়ালো, বর্ষাতিটার মধ্যে গা ঢোকাতে একটুক্ষণ সময় লাগলো তার, তার কোমরে আর কাঁধে কয়েকটা আঁকাবাঁকা ভঙ্গি হ'লো। আমি ঝট ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

'একটু দাঁড়াও, রুক্মি। আমিও যাচ্ছি।'

'খুব ভালো কথা। চলো।' তার ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতের আভা ঝিলিক দিলো। রেনকোটের বোতামগুলো সে লাগায়নি তখনও, ভেতরকার গোলাপি রঙের সিল্কের লাইনিং ঝিলিক দিচ্ছে, তার টকটকে লাল ব্লাউজ়টা যেন পৃথিবীর সব উজ্জ্বলতা নিয়ে তার গায়ের উপর এঁটে বসেছে। আমি এগিয়ে গেলাম দেয়ালে বসানো দেরাজের দিকে; একটা মোটা সোয়েটার প'রে নেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু রুক্মির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে আমার মাথার মধ্যে গোলমাল হ'য়ে গেলো, হঠাৎ এমন একটি কাজ ক'রে ফেললাম যা এক মুহূর্ত আগেও আমি ভাবিনি। তার পেছন থেকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম তাকে, তার গা থেকে বর্ষাতি খ'সে পড়লো।

'এ কী! তুমি করছো কী, ধীরাজ-দা!' আধো-হাসির সুরে ব'লে উঠলো রুক্মি, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, যেন ভাবছে এটা উদ্ভট ধরনের কোনো ঠাট্টা। সে সহজভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, আমি তাকে আমার দিকে ঘুরিয়ে নিলাম, বড়ো নিশ্বাস ফেলে ডাকলাম—'রুক্মি!'—তার ঠোঁটের ওপর ঠোঁট নামিয়ে আনলাম।

'এ কী! তুমি করছো কী, ধীরাজ-দা! না—না—না!' আমি শুনলাম ক্ষীণ আর্তনাদ, পাখির ডানার ঝাপটের মতো শব্দ, একবার তার চোখ যেন মস্ত বড়ো হ'য়ে খুলে গেলো, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, সেই অবাক-হওয়া চোখের ওপর আমি চোখ রাখলাম—কী দেখলো সে আমার চোখে জানি না, তার চোখ বুজে এলো আস্তে-আস্তে, কিন্তু এখন আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি, বড্ড কাছে চ'লে এসেছি, তার ঠোঁট আমার মুখের মধ্যে আটকানো, আমি টের পাচ্ছি আমার গালের ওপর তার গরম নিশ্বাস, আমার মুখের মধ্যে তার জিহ্বার সুগন্ধ, আমার বুকের ওপর তার হৃৎপিণ্ডের ধ্বকধ্বকানি—এমনি কাটলো

কতক্ষণ আমি জানি না, তারপর হঠাৎ এক ঝটকায় স'রে গিয়ে সে বেতের চেয়ারটার ওপর লুটিয়ে পড়লো। তার বাঁকানো পিঠের ওপর ছড়িয়ে গেলো তার চুল, আমি কান্নার শব্দ শুনলাম।

'ধীরাজ-দা, ধীরাজ—তুমি কী করলে, কেন করলে, এর কী দরকার ছিলো?'

আমি অন্য চেয়ারটিতে ব'সে সিগারেট ধরালাম। সে ছেলেমানুষের মতো বলতে লাগলো, 'আমার স্বামী আছেন, তিনি ভালো, আমাকে ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি—কিন্তু এ কী হ'লো, এ তুমি কী করলে, ধীরাজ!'

আমি নিঃশব্দে দেখতে লাগলাম রুক্মিকে। কথা ছিলো কৃষ্ণকলির—তার বদলে রুক্মি। পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া কোনো মেয়ে নয়—একজন বিবাহিত ভদ্রমহিলা, আটাশ বছরের এক সুখী, সুন্দরী, বিবাহিত যুবতী। এই প্রথম—মনে-মনে যতই নিজেকে বীর ব'লে ভাবি না, বা অন্যেরা ভাবুক আমাকে—এই প্রথম একজন বিবাহিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার···এক্সপেরিমেণ্ট। আর রুক্মির মতো মেয়ে, নিজেকে যে পুরোপুরি দখল ক'রে আছে মনে হয়, আর ব্যারিস্টার গগনবরনের মতো স্বামী, যিনি আস্ত একটা দেশ চালাবার যোগ্যতা রাখেন, আর অবন্তী ঘোষের মতো বিদ্বান একজন উপাসক, যার বই প'ড়ে বোঝার মতো মেধাবী লোক দুনিয়ায় একশো জনের বেশি নেই! অবন্তী রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে যত ইচ্ছে আলুর খোশা ছাড়াক, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না আর, শিঙাড়ার চেয়ে জরুরি একটা ব্যাপারে আমি আজ উৎরে গিয়েছি—হঠাৎ কী যে ঝোঁক চাপলো আমার, তা ভাগ্যে চেপেছিলো—আর এখন এই বিলাপ আর চোখের জল···সহ্য না-ক'রে উপায় কী।

রুক্মি—তার গালে কান্নার দাগ, আঁচলটা কুঁচকোনো, একগোছা চুল এলিয়ে আছে কপালে, আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। আমি বললাম, 'কাঁদছো কেন রুক্মি? তুমি তো তোমার স্বামীরই আছো।'

না—না—না!' হাতের পাতায় মুখ ঢাকলো সে, 'এ-রকম হবার কথা ছিলো না কখনো!'

'কিন্তু কী হয়েছে? আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি? তুমি আধ ঘণ্টা আগে যা ছিলে এখনো কি ঠিক তা-ই নেই?'

'না, ধীরাজ, না! আমার কষ্ট হচ্ছে—আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে!'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আস্তে বললাম, 'রুক্মি, ওঠো। চলো অর্কিড-হাউসে, বা অন্য কোথাও ঘুরে আসি চলো।' মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলাম তার বর্ষাতি আর বটুয়া। 'আমার ওপর রাগ কোরো না—ওঠো।'

'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না—আমারই দোষ, আমি অন্যায় করেছি। আমার মা—আমার বাবা—ছী-ছি!' আবার তার গলা আটকে এলো।

'তোমার মা, তোমার বাবা—তাঁরা তোমাকে তেমনি ভালোবাসবেন। তোমার স্বামী তোমাকে তেমনি ভালোবাসবেন। কিচ্ছু হয়নি, তোমার কোনো ক্ষতি হয়নি, অন্য কারো কোনো ক্ষতি হয়নি—সব ঠিক আছে।'

'কিন্তু লুকোতে হবে, ধীরাজ, বলতে পারবো না…'

'বলার মতো কোনো কথাই নয় এটা,' সে-মুহূর্তে আমার যা মুখে এলো তা-ই বলতে লাগলাম, 'এর কোনো মূল্য নেই তোমার জীবনে। তুমিও দু-দিন পরে ভুলে যাবে।'

'ভুলে যাবো? তুমি বলছো ভুলে যাবো?' তার চোখ যেন আরো অনেক কিছু প্রশ্ন করলো আমাকে, আমি আস্তে তার কাঁধে হাত রাখলাম। সে কেঁপে উঠলো, কোনো কথা বললো না।

আমি পাইচারি শুরু করলাম ঘরের মধ্যে, আর-একটি সিগারেট ধরালাম। এই ঘর, এই স্যাঁৎসেঁতে দিন, ঘরের মধ্যে মন-খারাপ ক'রে ব'সে-থাকা একটি মেয়ে, কোনো কথা নেই—আর ভালো লাগছে না আমার। একটা ছোট্ট ব্যাপারকে বাড়িয়ে দেখো না, রুক্মি, সত্যি তো কিছু হয়নি আজ, ভূমিকার আরম্ভটুকু মাত্র—কিন্তু তুমি যদি ভাবো, তোমার যদি মনে হয় এটা ভীষণ কিছু, তাহ'লে—তাহ'লে আর ব'সে আছো কেন, রুক্মি, আর আমাকেই বা আটকে রেখেছো কেন, বাড়ি গিয়ে ঘুমোলেই দেখবে কাল সকালে মন সাফ হ'য়ে গেছে। 'রুক্মি,' আমি পাইচারি থামিয়ে তাকালাম তার দিকে, তার চোখে আবার যেন প্রশ্ন ফুটে উঠলো, আমি কাছে গিয়ে সহজ সুরে বললাম, 'রুক্মি, অর্কিড-হাউসের কথা কি ভুলে গেলে? তুমি না এ-রকম বাদলার দিনে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসো? আর যদি বাড়ি যেতে চাও··· বলো··· তুমি যা বলবে আমি তাতেই রাজি আছি।' 'আমি যা বলবো তুমি তাতেই রাজি আছো?' রুক্মি উঠে দাঁড়ালো আস্তে-আস্তে, যেন অনেকক্ষণকার চাপা একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললো, 'না, ধীরাজ, এটা তুমি ঠিক বললে না।' 'যেমন ধরো, তুমি যদি আমাকে দার্জিলিং ছেড়ে চ'লে যেতে বলো—' আমার কথা শেষ হবার আগেই রুক্মি বললো, 'আমি বললেই বা তুমি শুনবে কেন, তুমি তো একজন স্বাধীন মানুষ।' 'কী জানো,' আমার সুর আরো হালকা হ'লো এবার, 'এমনিও ভাবছিলাম—এই দ্যাখো না এখনো রোদের দেখা নেই—ভাবছিলাম এ-রকম চললে ফিরে যাওয়াই ভালো।' 'ফিরে যাবে?' তার চোখে একটা চকিত ভাব

দেখলাম আমি, কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো, 'এখানকার রোদ-বৃষ্টির কথা কিছু বলা যায় না—কালই খুব ভালো দিন হবে হয়তো।' এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আবার বললো, 'যেয়ো না।'

সেদিন আর বেরোনো হ'লো না আমাদের ; সন্ধে অবধি কেটে গেলো হিমানী হোটেলে, বাইরে আবার ঝিরঝির বৃষ্টি নামলো।

৭

তড়বড় ক'রে এপ্রিল মাসটা ফুরিয়ে গেলো। ইতিমধ্যে রুক্‌মি আর আমি মিলে 'আমরা' হ'য়ে উঠেছি, আমি চলছি তার পায়ে পা ফেলে-ফেলে, যাচ্ছি তার সঙ্গে যেখানে সে বলছে—জলাপাহাড়ে, হেঁটে-হেঁটে ঘুম পর্যন্ত, এমনকি বিখ্যাত সূর্যোদয় দেখার জন্য কনকনে ঠাণ্ডায় রাত চারটেতেও বিছানা ছেড়েছিলাম। রোদ বৃষ্টি কুয়াশা, অনেক উঁচু-নিচু রাস্তা আর রুক্‌মি, অনেক আলোয় আর অন্ধকারে রুক্‌মি, বার্চ হিল-এ ঘাসের ওপর ব'সে গাছের ফাঁকে আকাশ দেখছে, আমার হোটেলের পর্দা-টানা ঘরে অন্ধকারে, কুয়াশা রোদ বৃষ্টি আর তার শরীর নিয়ে রুক্‌মি—এমনি কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন মে মাস—আর আমি ভাবছি এ-রকম আর কতদিন চলবে, আমার ফেরা উচিত এবার, মনে হচ্ছে কতকাল কলকাতার বাইরে, জগতের বাইরে

প'ড়ে আছি, এদিকে পুজোর লেখার সীজনও এসে গেলো—কিন্তু আমার অলস আর গেঁতো স্বভাবের জন্য যাবার দিন পেছিয়ে দিচ্ছি শুধু, আর তাছাড়া অবশ্য···ভাবতে গেলে আশ্চর্য, এ-রকম একটা জিৎ আমার জুটে যাবে আমি তা কল্পনাও করিনি। হ্যাঁ—মস্ত জিৎ, কিন্তু পুরোপুরি সুখের কিনা জানি না, আমি যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছি ভেতরে-ভেতরে, নিজেকে কেমন বন্দী মনে হচ্ছে—কৃষ্ণকলির সঙ্গে নিভৃতে দেখা হ'লে আগের মতো জমাতে পারি না, দু-একদিন এমন হয়েছিলো যে রাস্তায় রুক্মিকে আমাকে একসঙ্গে দেখে ছুটে এগিয়ে এসেছিলো কৃষ্ণকলি আর চন্দনা, খুব চওড়াভাবে হেসে বলেছিলো, 'এই যে ধীরাজবাবু, ভালো আছেন?' আর আমি বড্ড অস্বস্তিবোধ করেছিলাম। আমার ভয় হচ্ছিলো পাছে কোনো কুচুটেপনা করে মেয়ে দুটো, কোনো স্ক্যাণ্ডেল রটিয়ে দেয়—আমার অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু রুক্মির জন্যেও আমি দায়ী হ'য়ে পড়েছি, এই দায়িত্বটা আমার বিশ্রী লাগছে, অথচ পালাতেও পারছি না। কিন্তু একদিন একটি চমৎকার উপায়ে আমি ছাড়া পেলাম।

সেদিন সকালে আমি চন্দ্রকোণায় যাবার জন্য বেরোচ্ছি হোটেল থেকে, গোবিন্দবাবু আমাকে ডেকে বললেন, 'ধীরাজবাবু, আপনার একটা টেলিগ্রাম এলো এইমাত্র—এই যে।' ···আমি টেলিগ্রাম খুলে ভাবতে লাগলাম কী করি, মনস্থির করতে দু-তিন মিনিট সময় লাগলো। গোবিন্দবাবু উদ্বিগ্ন স্বরে জিগেস করলেন, 'কোনো খারাপ খবর নয় তো?' 'না, খারাপ কিছু নয়, কিন্তু আমাকে আজই চ'লে যেতে হবে।' 'আজই চ'লে যাবেন? কেন বলুন তো?' 'এই একটা কাজ প'ড়ে গেছে হঠাৎ—ব্যাপারটা জরুরি—আজ কোনো প্লেন ধরা যায় না?' গোবিন্দবাবু ফোন তুললেন তক্ষুনি, ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স ভর্তি, কিষণ

কোম্পানির কার্গো প্লেনে জায়গা পাওয়া গেলো। তখন সকাল দশটা, প্লেন ছাড়বে তিনটে-পঞ্চাশে বাগডোগরা থেকে, সাড়ে-বারোটায় বাস্, আমার সময় নেই—আমি হোটেলের ঘরে ফিরে গেলাম।

স্যুটকেস গোছাতে-গোছাতে রুক্মির কথা মনে পড়লো। তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাওয়া—উচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু ওখানে তো ট্যাক্সি যাবে না, পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসাতেই চল্লিশ মিনিট, তাছাড়া সে যদি বলে আজকের দিনটা থেকে যাও তাহ'লে আমি না ট'লে যাই আবার—এদিকে দাদা চিঠির বদলে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, আমার 'হৃদয়হীনা' গল্পটার ডবল-ভার্শন কিনতে চাচ্ছে ব্রিজলাল ব্রাদার্স—শাঁসালো পার্টি, কিন্তু ওদের আবার বড্ড সহজে মন ঘুরে যায়—আমার উত্তেজিত লাগছে, বারো বা চোদ্দ হাজার টাকার একখানা চেক আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, অন্য কিছুতে মন দিতে পারছি না—কিন্তু রুক্মি, তাকে একবার জানিয়ে যাওয়া কি উচিত নয় আমার? লোকের হাতে একটা চিঠি দিয়ে পাঠাবো? নাঃ, তাতেও মুশকিল, যদি খবর পেয়েই চ'লে আসে তক্ষুনি, ঠিক যখন বেরোতে যাচ্ছি সেই মুহূর্তেই—তাকে ছেড়ে যেতে আমারও একটু কষ্ট হচ্ছে না তা তো নয়, মুখোমুখি দেখা হ'লে আরো বেশি খারাপ লাগবে সন্দেহ নেই, আর তাছাড়া ঐ ঘটা ক'রে বিদায় নেয়া-টেয়া আমার একদম আসে না। এসে শুনবে গোবিন্দবাবুর মুখে, তা-ই ভালো। দু-লাইন লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিই বরং—ঠিক, ও যখন চিঠি পাবে তার অনেক আগেই আমি কলকাতায়। আজ সন্ধেবেলা, আজ সন্ধেবেলাতেই···

'রুক্মি বোধহয় হিমানী হোটেলে এলো এতক্ষণে'—বাগডোগরায় বাস্ থেকে নেমে আমি ভেবেছিলাম। 'রুক্মি কি বাড়ি ফিরে গেলো?

না ঘুরে বেড়াচ্ছে? ···আজ সন্ধেবেলাটা ফাঁকা লাগবে ওর।··· শিগগিরই রোংটুতে যাবার কথা···পাটনায় ফেরার দিনও প্রায় এসে গেলো, এবার হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে···আজ সন্ধেবেলাটা ফাঁকা লাগবে ওর···'এমনি কয়েকটা কথা, চলন্ত প্লেন থেকে রং-বেরং সূর্যাস্ত দেখতে-দেখতে, আমার মনের ওপর দিয়ে মেঘের মতো ভেসে গিয়েছিলো। কিন্তু দমদম থেকে যত এগোচ্ছি শহরের দিকে, তত আমাকে শুষে নিতে লাগলো কলকাতা, তত আমি মিনিটে-মিনিটে চাঙ্গা হ'য়ে উঠছি, আর বড়োবাজারে কিষণ কোম্পানির ডিপোতে নেমে যখন ট্যাক্সিতে বাড়ির দিকে চলেছি, তখন কলকাতার গ্রীষ্মের তাপ, ফুটপাতের ভিড়, ট্রাফিকের শব্দ, কলকাতার আলো আর ধুলো আর ভিখিরি আর ফেরিওলা—সব যেন হাজার হাতে আমার অভ্যস্ত জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো আমাকে। ঘড়িতে দেখলাম আটটা—এখনই বাড়ি যাওয়ার কোনো মানে হয় না—এস্‌প্লানেডে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে কাপ্রি কাফেতে নামলাম। আমি স্যুটকেস হাতে ঢোকামাত্র কয়েকটা চেনা গলা চেঁচিয়ে উঠলো—'এই যে!' একটা গ্লাশ ভাঙার শব্দ হ'লো।

৮

আমি রুক্‌মিকে ছেড়ে চ'লে এলাম, আবার রুক্‌মি একদিন ফিরে এলো আমার কাছে—কিন্তু মাঝখানকার দুটো বছর—আমি কী করে-ছিলাম এখন যেন ঠিক মনে পড়ছে না। অনেক কিছু করেছিলাম নিশ্চয়ই, আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলো লোকেরা—আমাকেও, চাহিদার চাপে রীতিমতো একজন 'ব্যস্ত' মানুষ হ'য়ে উঠতে হয়েছিলো। এন্তার লেখা বেরোচ্ছে, দুটো সাপ্তাহিকে একই সঙ্গে দুটো ধারাবাহিক চালিয়ে যাচ্ছি, তার ওপর পূজা-সংখ্যার ধুমধাড়াক্কা—কেউ ছাড়বে না আমাকে, ছোটো-ছোটো কাগজওলারা বলে যা হয় পাঁচ-সাত স্লিপ ঝেড়ে দিন, ধীরাজ-বাবু—আপনার নামটা আমরা চাই!—এমন শোচনীয় আমার অবস্থা যে কাপ্রিতে বিয়ার নিয়ে ব'সেও কলম ঠেলতে হয় মাঝে-মাঝে, কী লিখলাম নিজে প'ড়ে দেখারও সময় পাই না। এর উল্টো পিঠে

চলছে নানান ধরনের বেড়ানো-খেলানো—আমার ফিল্মের হিন্দি ভার্শন উপলক্ষে রাজার হালে বম্বাই বেড়িয়ে এলাম একবার, আর-একবার এক নতুন বান্ধবীকে নিয়ে কাশ্মীরে—এগুলো তখন বেশ রমরমে ব্যাপার ব'লে আমার মনে হয়েছিলো, কিন্তু এখন—এই যে আমি ধীরাজ দত্ত, বিয়াল্লিশ বছরের ভদ্রলোক, যে চেয়েছিলো সাধারণের মধ্যে সাধারণ হ'তে কিন্তু তাও পারেনি, স্ত্রীকে খুশি করার জন্য দার্জিলিঙে এসে অবধি যে শান্তি পাচ্ছে না, এই আমার কাছে ও-সব দিন ঝাপসা। শুধু একটা দিন বার-বার ফিরে আসছে।

সেদিনও ছিলো মে মাস, ছিলো মঙ্গলবার, আজকের মধ্যে 'বাঁশরি'র কিস্তি পৌঁছনো চাই, একটার সময় বাড়িতে পিওন পাঠাবেন হরিসাধন-দা। আমি সকালে উঠেই টেবিলে ব'সে গেছি, কিন্তু আগের কিস্তি কোথায় শেষ হয়েছিলো মনে করতে পারছি না। ফাইল খোঁজার জন্য দেরাজ ঘাঁটতে গিয়ে কয়েকটা চিঠি আমার চোখে পড়লো। পুরোনো চিঠি—খাম খোলা—এনভেলাপ মলিন হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এনভেলাপের ওপর হাতের লেখাটা ঠিক চিনতে পারলাম না, শুধু মনে হ'লো কবে যেন কোথায় দেখেছিলাম। আমার কৌতূহল হ'লো, দু-আঙুলের ফাঁকে একটা খাম গোল ক'রে ধ'রে উঁকি দিলাম ভেতরে, কাগজের মাথায় 'চন্দ্রকোণা, দার্জিলিং' ছাপানো। ও, সেই মেয়েলি উচ্ছ্বাস—এই দেরাজেই ছিলো নাকি এতদিন? একটা জবাব দিলে হ'তো কোনো সময়ে, কিন্তু এমন চলছে না আজকাল, এক ফরমাশ থেকে আর-এক ফরমাশে ঠোক্কর খেতে-খেতে ফুরশৎ পাই না একটুও।

আমার উপন্যাসের ফাইল খুঁজে পাওয়া গেলো, একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। এটা একটু নতুন ধরনের হচ্ছে—শ্রীযুক্ত ক শ্রীমতী খ-র সঙ্গে প্রেম করছেন, শ্রীমতী ক সেটা জানেন আর তিনি যে

জানেন বা সন্দেহ করেন শ্রীযুক্ত ক-র তা অজানা নেই, কিন্তু শ্রীমতী ক যে শ্রীযুক্ত গ-র দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ছেন তা শ্রীযুক্ত ক জানেন না বা সন্দেহ করেন না, এদিকে শ্রীযুক্ত খ-র পিছনে এক অশনাক্ত নারীকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে···এমনি একটা কাঠামো নিয়ে খুব ঘুরপাক করাচ্ছি লোকগুলোকে, এ-সংখ্যায় শ্রী ও শ্রীমতী ক-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি কলকাতার বাইরে, সেখান থেকে শ্রীমতী ক একটা চিঠি লিখবেন শ্রীযুক্ত গ-কে, সেটা কী-রকম হবে ভাবতে গিয়ে আমার কলম থেমে গেলো মুহূর্তের জন্য। তাকিয়ে দেখি, রুক্মির চিঠিটা টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে। তাই তো, ও থেকে কিছু তুলে দেয়া যায় না? 'চন্দ্রকোণা, দার্জিলিং' ছাপানো কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলাম আমি, তারপর হঠাৎ লক্ষ করলাম আমার কলম থেমে আছে, এদিকে ঘড়িতে প্রায় এগারোটা, আমাকে আর দু-ঘণ্টার মধ্যে কিস্তি শেষ ক'রে দিতে হবে। আমি কলমটাকে দৌড় করালাম এর পরে, এক দমকে চার স্লিপ এগিয়ে গেলো, এবারে শ্রীমতী ক-র পত্ররচনা—দেখা যাক রুক্মি আর কী লিখেছিলো।—আমি আর-একটা খাম থেকে চিঠি বের করলাম, তারপর আর-একটা···'বাঁশরি'র পিওন এসে ফিরে গেলো। চারটে নাগাদ আমি নিজেই গিয়ে কিস্তি দিয়ে এলাম হরিসাধন-দার হাতে। 'এবারে এত ছোটো কিস্তি?' 'কিছু ভাববেন না, সামনের বারে পুষিয়ে দেবো।' সন্ধেবেলা বিরাট দল জুটলো কাপ্রিতে, তারপর চিৎপুরের আকবর-কেবিনে মোরগ-মসল্লা—আঃ, হেভ্‌নলি!

কিন্তু পরের সপ্তাহের কিস্তি লিখতে ব'সে আমার আবার মনে প'ড়ে গেলো।

পাঁচখানা চিঠি সব সুদ্ধ—দুটো চন্দ্রকোণা থেকে লেখা, একটা রোংটু থেকে, আবার পাটনা থেকে দু-খানা। প্রথমটা লিখেছিলো আমি চ'লে

আসার পরের দিনই (তারিখ থেকে, আর চিঠি থেকেও তা স্পষ্ট বুঝলাম) অন্যগুলি পরের দু-মাসের মধ্যে। একবার, দু-বার, তিনবার পড়লাম আমি—হঠাৎ মনে হ'লো ঘরে যথেষ্ট হাওয়া নেই, আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

সেবার 'বাঁশরি'তে নোটিস বেরোলো: 'অনিবার্য কারণে "পঞ্চকোণে"র কিস্তি এ-সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো না, আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।' হরিসাধন-দা বেশ একটু ভারি গলায় বললেন, 'দেখো ধীরাজ, আর যেন এ-রকম না হয়।' তাঁর কথা শুনে হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে চিড়িক ক'রে উঠলো, জবাব দিলাম, 'অমন বস্-এর টোনে কথা বলছেন কেন, আমি তো আর কখনো খেলাপ করিনি, আমার কি শরীরও খারাপ হ'তে নেই?' 'না, না, আমি বলছিলাম এর পরেই তো পুজোর চাপ পড়বে, এবার একসঙ্গে অনেকখানি লিখে দাও, তাতে তোমারও সুবিধে, আমারও নিশ্চিন্তি।' 'অনেকখানি কেন, একেবারে শেষ ক'রেই দেবো আপনাকে—এ-মাসের মধ্যেই।' 'তাহ'লে তো কথাই নেই। কিন্তু দেখো আবার, হুট ক'রে শেষ ক'রে ফেলো না। কার্তিক মাস অবধি চালানো চাই।' 'তা আপনি যা বলেন।' আমি আরো খানিকক্ষণ এটা-ওটা গল্প করলাম হরিসাধন-দার সঙ্গে, তিনি বয়সে অনেক বড়ো আমার, আমাকে যখন কেউ চেনে না তখন থেকে আমার লেখা ছাপছেন—আমার খারাপ লেগেছিলো তাঁকে একটা তেড়িয়া কথা ব'লে ফেলেছিলাম ব'লে, সে-মুহূর্তেই মনস্থির করলাম 'পঞ্চকোণ' শেষ না-ক'রে অন্য কোনো কাজে হাত দেবো না।

কিন্তু কেমন ক'রে যে শেষ করেছিলাম, কত কষ্টে, কত কেটে, ছিঁড়ে, তাপ্পি লাগিয়ে, মাথা ফাটিয়ে—আর কী সাংঘাতিক, প্রকাণ্ড, পাথরের মতো অনিচ্ছা ঠেলে-ঠেলে, তা··· যদি বলতে পারতাম

কাউকে, যদি আমার তখনকার মনটাকে কারো কাছে খুলতে পারতাম।

—'ধীরাজ, আমাকে ভুলে যেয়ো না—চিঠি লিখো—আমাকে ভালোবেসো।' কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি আমি, রুক্মির গলায় থেকে-থেকে, মাঝে-মাঝে, সারাক্ষণ। 'ধীরাজ, আমাকে ভুলো না, আমাকে ভালোবেসো।' এ কি সম্ভব আমি কোনো উত্তর দিইনি? এ কি সম্ভব এর আগে শুনতে পাইনি তার কথা? এ কি সম্ভব চিঠিগুলো আমার কাছে পৌঁছলো—দু-বছর পরে, এইমাত্র? আমি কোথায় ছিলাম এতদিন, কী করছিলাম, কী করছি?

ও, হ্যাঁ—সেই 'পঞ্চকোণ' আমাকে শেষ করতে হবে। কিন্তু এ-সব কী—এই যে শ্রী ও শ্রীমতী ক, শ্রী ও শ্রীমতী খ, আর একজন শ্রীযুক্ত গ, যাঁকে এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, আবার তাঁর পেছনে ঝাপসা আর-এক শ্রীমতী, আর এত সব ঘোরপ্যাঁচ হেঁয়ালি চালাকি ওলোটপালোট—কী হয় এ-সব দিয়ে, এর মধ্যে কোন কথাটা আছে যা বলার যোগ্য, শোনার যোগ্য, কেন পড়ছে লোকেরা, আর আমিই বা লিখছি কেন? আমার অবাক লাগলো ভাবতে, একটা ভয়াবহ ব্যাপার ব'লে মনে হ'লো, যে পঞ্চাশ হাজার সাবালক মেয়ে-পুরুষ এ-ই গিলছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, লোলুপ হ'য়ে আছে এরই জন্য, সকলেই কি আমারই মতো তবে—কেউ কিছু জানে না, ভাবে না, বোঝে না? কী সাংঘাতিক, যে এইটে আমাকে চালিয়ে যেতে হবে—আরো পাঁচ মাস—একুশ সপ্তাহ—বানাতে হবে, বাড়াতে হবে, সাজাতে হবে, রং লাগাতে হবে—এ-ই কি আমি ক'রে আসছিলাম এতদিন ধ'রে, এরই জন্য আমি নামজাদা?

তবু—আমি হরিসাধন-দাকে কথা দিয়েছি, সে-কথা আমাকে রাখতেই হবে।

আমি অবশ্য সহজে হার মানিনি, দোহাত্তা ল'ড়ে গিয়েছিলাম, আমার জবরদস্ত সহায় ছিলো অভ্যেস। ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছি বিকেল চারটে থেকে রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত—কোনো পত্রিকার আপিশ, কোনো প্রকাশকের আস্তানা, মাঝে-মাঝে সাহিত্যসভা বা কোনো নাটকের প্রথম রজনী, যেখানে প্রথম সারির নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই আমার পরিচিত, আর অবশ্য কাপ্রিতে হাজিরা দিতেও ভুল হচ্ছে না—আমার সেই জগৎ যেখানে আমি নদীর জলে মাছের মতো স্বচ্ছন্দ, যেখানে আমি হাসি এবং হাসাই, গল্প বলি এবং গল্প শুনি, উৎসাহ পাই ও উৎসাহ দিয়ে থাকি—সেই জগৎটাকে আঁকড়ে ধ'রে আছি আমি, কেননা তখনও জানি অন্য কোনো জায়গা আমার নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে খটকা লাগে আমার, মনটা যেন চুপ হ'য়ে যায়, আমারই কোনো রসিকতায় বন্ধুরা যখন হো-হো ক'রে হেসে ওঠে আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। রসিকতা—তার মানে তো কোনো অনুপস্থিত মানুষকে নিয়ে বিদ্রূপ? গালগল্প—তার মানে কি গুজব চটকানো—যতো উড়ো খবর কলকাতার হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ (আশ্চর্য শহর, সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর জানে ব'লে মনে হয়)—অমুক অভিনেতার পাটরানী এখন কে, তমুক লেখকের চাকরিও নেই বইয়েরও বিক্রি নেই তাহ'লে ছেলেকে বিলেত পাঠালো কী ক'রে, কলকাতার কোন টেনিস-খেলোয়াড় জাপানে খেলতে গিয়ে মাতাল হ'য়ে ছিলো সারাক্ষণ, কোন মন্ত্রীমশাই তাঁর ভাগনিকে সঙ্গে না-নিয়ে কোনো বৈদেশিক সফরে যান না—এমনি সব, কেউ যা জানে না তা নিয়ে কথা, যাতে কারো কিছু এসে যায় না তা নিয়ে—কিন্তু এ-ই তো বলছে সবাই, ছেলে-বুড়ো বাদ নেই কেউ, আর সত্যি তো এ-সব ছাড়া আড্ডা জমে না। মাঝে-মাঝে আমার বন্ধুরা বলে, 'কী রে, তোর হ'লো কী আজ, চুপ ক'রে আছিস?' 'কিছু না।' আমার যে

কিছু হয়নি তা প্রমাণ করার জন্য মুখ টিপে হেসে হয়তো বলি, 'আমি মন্দাকিনীর কথা ভাবছিলাম।' 'মন্দাকিনী? তার আবার নতুন কী হ'লো?' 'সে আবার বিয়ে করেছে।' 'কাকে? কাকে?' একসঙ্গে অনেক গলা খলখল শব্দ ক'রে ওঠে, আমি গম্ভীর সুরে জবাব দিই, 'ওর ভূতপূর্ব প্রাণেশ্বর অমিতাভকেই।' 'অমিতাভকেই?' ব্‌বাঃ! আর সুব্রত? তার কী অবস্থা?' 'গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়িতে সে আর অমিতাভ নাকি ঘুষোঘুষি করেছিলো একদিন—দু-জনেই মাতাল ছিলো, দু-জনেই নক্‌ড-আউট!' —হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই, আড্ডা ফের জ'মে ওঠে সঙ্গে-সঙ্গে, ব্যাপারটাকে চিবিয়ে-চিবিয়ে ছিবড়ে না-করা পর্যন্ত ছাড়ি না আমরা—আর রাত্রে বাড়ি ফিরে আমার মনে হয়—অত হাসলাম কেন, ও-সব কথায় হাসির কী আছে, মানুষের দুঃখ নিয়ে কেন হাসি আমরা, কেন মানুষের সুখ নিয়ে ঠাট্টা করি—কী নেই আমাদের জীবনে, কোন গর্ত বোজাবার জন্য এত হাসাহাসি?···অবস্থাটা, যাকে বলে মর্বিড, তা-ই।

আর সত্যিও, যেমন আমাদের শরীরের মধ্যে কোনো রোগের বীজাণু প্রথম ঢোকে যখন—আমরা টের পাই না, খাচ্ছি ঘুমুচ্ছি বেড়াচ্ছি, সবই ঠিক আগের মতো চলছে, কিন্তু হঠাৎ একদিন একটু জ্বর বা গলা-খুশখুশ বা রাত্রে ভালো ঘুম হ'লো না—আমরা উড়িয়ে দিই সেগুলোকে, লাফিয়ে চলতি বাস্‌-এ উঠে পড়ি, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বীফ-রোল খাই আর চিবোবার তালে তাল মিলিয়ে হিন্দি ফিল্মের গানের সুর ভাঁজি—কিন্তু ইতিমধ্যে বীজাণুগুলো ছড়িয়ে পড়েছে রক্তের মধ্যে, আমাদের চাইতে অনেক বেশি জোরালো হ'য়ে উঠেছে, আবার জ্বর, ঘুরে-ঘুরে জ্বর, জিভ তেতো, খেতে ইচ্ছে নেই, তারপর বিছানায় লম্বা হ'তে হয় একদিন—তেমনি রুক্‌মি বেড়ে উঠলো আমার মধ্যে, আস্তে, লুকিয়ে-লুকিয়ে, নিজে

জায়গা ক'রে নেবার জন্য সরিয়ে দিলো আমার স্বাস্থ্য আর সুখ—যা-কিছু নিয়ে আমি সুখী ছিলাম এতদিন। আমাকে সে গরিব ক'রে দিলো, বেকার ক'রে দিলো—পূজা-সংখ্যার ফরমাশ আছে অনেকগুলো, সময় এসে যাচ্ছে, কিন্তু আমি কোনটাতেই হাত দিচ্ছি না, দিতে পারছি না—দাঁতে দাঁত চেপে 'পঞ্চকোণ' শেষ ক'রে দিয়েছি, এখন কোনো লেখার কথা ভাবতেই আমার বমি পায়। সেবারে বাংলাদেশের নানান বয়সী বালকবালিকারা বড্ড ব্যাজার হ'লো—কোনো পূজা-সংখ্যায় ধীরাজ দত্তর একটি লেখাও পাওয়া গেলো না।

আমি একা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম কলকাতায়, পায়ে হেঁটে অনেক রাস্তা চ'ষে ফেললাম। মাঝে-মাঝে কোনো চায়ের দোকানে বসি, বা ঢুকে পড়ি বেপাড়ায় কোনো শস্তা বার-এ যেখানে বন্ধুরা আমার খোঁজ পাবে না। কোথাও চলে খেলার খবর, খুচরো পলিটিক্স, কোন অফিসার কত ঘুষ নেয় ইত্যাদি—আর কোথাও কোনো কালো মোটা জোয়ান পুরুষ গেঞ্জি-গায়ে ব'সে থাকে একা, টিমটিমে আলোয় মদে চুর হ'য়ে—তার লাল চোখ আর ডুমো-ডুমো গাল দেখে আমার কেমন ভয় করে হঠাৎ, তাড়াতাড়ি চম্পট দিই সেখান থেকে। মাঝে-মাঝে আড্ডায় ফিরে যাই—গিয়েই মনে হয় এখানে আমার কী করবার আছে, কেন আমি এলাম এখানে?

ঘুরতে-ঘুরতে একদিন শ্যামবাজারে পাঁচ-রাস্তার মোড়ের কাছে চ'লে এসেছিলাম। প্রায় সন্ধে তখন, সারি-সারি বস্ত্রালয় আর ঘেঁষাঘেঁষি পাঁচটা-ছ'টা সিনেমা তাদের উগ্র আলো জ্বেলে দিয়েছে, আশে-পাশে সবগুলো দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি বিজ্ঞাপনে মোড়া, শূন্যে ঝুলছে চিত্রতারকাদের বিরাট ছবিওলা প্ল্যাকার্ড—ভিড়ে, ব্যস্ততায়, আলোয় আর আলোর গরমে জায়গাটাকে একটা মস্ত বড়ো ফুটন্ত কড়াইয়ের মতো

মনে হ'লো আমার। ম্যাটিনি-শো ভাঙলো, পিঁপড়ের মতো পিলপিল ক'রে বেরিয়ে আসছে লোকেরা—মেয়ে, পুরুষ, বালিকা, বৃদ্ধা—ফুটপাত ছাপিয়ে উপচে পড়লো হাজার নমুনার মানুষ, কিন্তু সে-মুহূর্তে সকলেই যেন একরকম। আমার ইচ্ছে করলো সেই চঞ্চল ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে, আমিও তো এদেরই একজন, কিন্তু পারছি না কেন—কেন আমার এই অস্বাভাবিক অস্বাস্থ্যকর নিঃসঙ্গতাবোধকে ডুবিয়ে দিতে পারছি না জনতার সমুদ্রে, উত্তেজনার ধোঁয়া-উগরোনো ফেনায়? হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে মেয়েলি গলায় শুনলাম, 'এই যে, ধীরাজবাবু—ভালো তো?' আমি বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম, মেয়েটি বললো, 'আমাকে চিনতে পারছেন না? সেবার দার্জিলিঙে—' 'ও, হ্যাঁ, বুঝেছি।' আমি হঠাৎ চিনতে পারলাম কৃষ্ণকলিকে—কানে দুল, হাতে চুড়ি, গলায় হার, আর সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে বিলকুল বদলে গিয়েছে সে, হ'য়ে উঠেছে মূর্তিমতী দাম্পত্য সুখ, তার সারা মুখে ঘামের মতো লেপটে আছে তৃপ্তি। পাশের যুবকটির দিকে ইঙ্গিত ক'রে সে ছলছলে গলায় বললো, 'এই লোকটি কে তা বুঝতেই পারছেন, আর ইনি বিখ্যাত লেখক...' যুবকটি বললো, 'কত ভাগ্যে আজ আপনার দেখা পেলাম। সত্যি, আপনার লেখা...' 'জানেন, ধীরাজবাবু,' আত্মসচেতন মিহি গলায় কৃষ্ণকলি ব'লে উঠলো, 'ইনি হাতুড়ি-পেটা এঞ্জিনিয়র মানুষ, কিন্তু সাহিত্য খুব ভালোবাসেন। তা আসুন না এক পেয়ালা চা খেয়ে যাবেন আমাদের সঙ্গে। আমরা কাছেই থাকি।' আমি চেষ্টা ক'রে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'আমি ব্যস্ত আছি। চলি।'

—কিন্তু কোথায় যাবো? আমার চিরপ্রিয় চিরপুরোনো চিরনতুন এই কলকাতা—আমি কি তাকে হারিয়ে ফেলছি? কৃষ্ণকলির মুখের একটা হালকা কথা আমার বুকের মধ্যে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে গেছে,

অনেকক্ষণ ধ'রে তার রেশ চলতে লাগলো—দার্জিলিং···দার্জিলিং। আমার মনে হ'লো কে যেন আমাকে চুলের ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—সেই দার্জিলিঙে, রুক্মির কাছে, অনবরত।

কিন্তু শুধু রুক্মি নয়, তার সঙ্গে জড়ানো আরো অনেক-কিছু যা তখন আমি লক্ষ করিনি, যা কিষণ কোম্পানির কলকাতা-মুখো প্লেনে ওঠামাত্র আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিলো, অন্তত আমি তা-ই জানতাম —তারাও এখন দাবি করছে আমাকে, ধ'রে ফেলছে।

সেই সব ফুল যাদের নাম রুক্মি শিখিয়েছিলো আমাকে—উইস্টেরিয়া, সুইট পী, নেস্টার্শাম, ম্যাগনোলিয়া—বিদেশী নাম, বিদেশী ফুল, কিন্তু তাদের নীল শাদা বেগনি আর গোলাপি রংগুলো সব দেশেরই, তারা ইংরিজিতে কথা বলে না, শুধু তাকিয়ে থেকে কথা বলে। আর দিনে-রাত্রে পাহাড়, বরফে মোড়া সারি-সারি চুড়ো—মানুষের অনেক আগে যারা এসেছিলো এই পৃথিবীতে আর মানুষ চ'লে যাবার পরেও থাকবে ব'লে ধ'রে নেয়া যায়—তারাও হয়তো, শুধু চুপ ক'রে থেকে, শুধু একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, সকালে সন্ধ্যায় সোনালি লাল বেগনি রঙে মাখামাখি হ'য়ে, আর রাতের অন্ধকারে দুধের শাদা ছড়িয়ে দিয়ে, তারাও হয়তো কিছু বলতে চায় আমাদের—রুক্মি একদিন তা-ই বলেছিলো, দার্জিলিঙের পুরোনো বাসিন্দা হ'য়েও সে মাঝে-মাঝে এমন-ভাবে তাকায় যেন এই প্রথম পাহাড় দেখছে। পথ চলতে-চলতে প্রতিটি কুকুর লক্ষ করে সে—'ঐ দ্যাখো, ডাক্‌শহুণ্ড, ওটা গ্রেট ডেইন—কোলি—সীলাম—হুইপেট—' বাঘের মতো মস্ত আবার পুতুলের মতো একরত্তি, ঝোলা-ঝোলা লোম আবার চাবুকের মতো আঁশ-ছাড়ানো চামড়া, আর চোখ নাক মুখ এত রকমারি যেন ফরমাশ দিয়ে তৈরি করানো। আর সেই যে একদিন কয়েক মিনিট দার্জিলিঙের

বাজারে ঘুরেছিলাম তার সঙ্গে—সেটাও যেন যাকে বলে একটা অভিজ্ঞতা—আমি রুক্মির চোখ দিয়ে দেখেছিলাম থরে-থরে সাজানো সব্জিগুলোকে, যেন পৃথিবীর সব লাল-সবুজের আশ্চর্য এক মেলা ব'সে গেছে—কিন্তু তখন তা বুঝিনি, আমার মন তখন সেখানে ছিলো না। আর রাস্তাগুলি—উঁচু, নিচু, অঁাকাবাঁকা, দু-দিকে গাছপালার সবুজ, আলো আর ছায়া, হাফ-মাইল ক্রেসেণ্ট দিয়ে উঠতে-উঠতে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলা, আর ঘাসের গন্ধ পাতার গন্ধ বনের গন্ধ—একদিন জলাপাহাড়ের পথে কুয়াশায় আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম, পোস্টাশিপের বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ, কুয়াশায় সব দৃশ্য ঢেকে গেছে কিন্তু সেটাই এক দৃশ্য—দাঁড়িয়েছিলাম টাইগার হিল্-এ পাশাপাশি, মোটরের রাস্তার পরে শেষ চড়াইটুকু বুক-ভাঙা, আমরা কথা বলার মতো দম পাইনি, আকাশে অনেক তারা জ্বলছিলো, এত উজ্জ্বল আর বড়ো-বড়ো তারা আগে কখনো দেখিনি, যেন নিশ্বাস ফেলছে, যেন জীবন্ত :—এই সব আমাকে শিখিয়েছিলো রুক্মি ; ফুলেরা কত সুন্দর, পশুরা কত সুন্দর, কত ভালো স্তব্ধতা আর নির্জনতা, কত বড়ো এই জগৎ আর আরো কত বড়ো-বড়ো জগৎ আকাশে এখন তৈরি হচ্ছে—অন্য জীবন, অনেক জীবন, জীবনের অনেক সম্ভবপরতা—এ কি হ'তে যে আমি কিছুই মনে রাখিনি, কিন্তু তা-ই যদি হবে তাহ'লে এখন আমার মনে পড়ছে কী ক'রে?

যা-কিছু আমি দেখেছিলাম তার সঙ্গে, শুনেছিলাম, একটু-একটু অনুভবও করেছিলাম হয়তো, সে-সবের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে রুক্মিকে আমি নতুন চোখে দেখতে পেলাম, আমার মনের কাছে সে অনেক বেশি স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, অনেক বেশি সত্যি। আমি দেখতে পেলাম ছেলে-বেলার রুক্মিকে (মাঝে-মাঝে তার ছেলেবেলার কথা বলতো সে)—দেড়

হাজার প্যাগোডার শহর মান্দালয়, কাঠে তৈরি অনেককালের সেই রাজবাড়ি যা ইংরেজরা যুদ্ধের সময় ভেঙে দিয়েছিলো, কিন্তু ছোটো মেয়ে রুক্‌মি যার লাল দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো সূর্যাস্তের সময়; তাদের জানলা দিয়ে দেখা ইরাবতী নদী, যার ওপর দিয়ে বড়ো-বড়ো ভেলায় সেগুনগাছের চালান যাচ্ছে রেঙ্গুনে; আর তার স্কুল, মাদার ম্যাডলীন, সিস্টার সোফিয়া—তার নিয়মে বাঁধা স্থির শান্ত জীবন—অন্য দেশ, অন্য জীবন, অন্য অনেক জীবন—আমি, কলকাতার ছেলে, গড়িয়াহাটের মোড়ে আড্ডা দিতে-দিতে বড়ো হয়েছি—এতদিন আমার কল্পনাতেও যা ছিলো না। যেমন ছেলেবেলায়, তেমনি বড়ো হ'য়েও শান্তিনিকেতনে, রোংটুতে—বিয়ের পরে পাটনাতেও হয়তো—তার সময় জুড়ে ছিলো গাছপালা ফুল পাখি কুকুর, আর নানান ধরনের বই (চন্দ্রকোণায় তার নাম লেখা এমন অনেক বই দেখেছিলাম আমি যার নামও শুনিনি)—একটি উচ্ছ্বাসহীন সুখী মানুষ, তার জীবন যেন চারদিকের সঙ্গে সুর মেলানো, বাইরের দিক থেকে আমার তুলনায় ছেলেমানুষ নিশ্চয়ই, কিন্তু মনের দিক থেকে…জানি না।

কিন্তু রুক্‌মি, তুমি কী দেখেছিলে আমার মধ্যে, এই আলগা-চকচকে ধীরাজ দত্তর মধ্যে তুমি কী দেখেছিলে বলো তো? তুমি তো বিশ্বাস করো জীবনে স্থির ব'লে কিছু আছে, তুমি তো জেনেছিলে নিয়মটাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেবার মতো সুখ আর-কিছু নেই—সেই নিয়ম কেন ভাঙলে তুমি, কেন বেরিয়ে এলে সেই স্থৈর্য থেকে…আমার জন্য? তবে কি আমারও মধ্যে কিছু ছিলো—এখনো আছে—যা বানানো নয়, খাঁটি, কারসাজি নয়, সত্য—যা আমি জানতাম না কিন্তু তুমি দেখতে পেয়েছিলে? আমি তোমাকে আর-একবার দেখতে চাই, রুক্‌মি, কিছু বলতে চাই, কিছু শুনতে চাই তোমার মুখে—তখন কিছুই বলা হয়নি,

কিছুই না।—যদি বলতে নাও পারি শুধু একবার চোখে দেখতে চাই—তুমি কেমন আছো রুক্মি, কোথায় আছো ?

আবার কখনো-কখনো আমার মনের মধ্যে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। নিজেকে চাবুক মেরে বলি তখন : 'ছি। লজ্জা করে না তোমার। একটা মেয়ের জন্য ছারখার হ'য়ে যাচ্ছো।' চেষ্টা করি নানারকম চিকিৎসা, ধোপদুরস্ত হ'য়ে কোনো পুরোনো বান্ধবীর কাছে চ'লে যাই—কিছু কথা এগোয় না, তার ছিঁড়ে গেছে। কখনো ভাবি, বিয়ে ক'রে ফেললেই রুক্মির ভূত নামাতে পারি ঘাড় থেকে, বৌদিকে একদিন ব'লেও ফেলেছিলাম পাত্রী খুঁজতে—বৌদি প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিলেন, তারপর একদিন কথায়-কথায় বললেন তাঁর দিল্লিবাসী ছোটো মামার মেয়ের কথা—দেখতে ভালো, সাইকলজিতে এম.এ., এদিকে গান-বাজনাও মন্দ জানে না—মামা একমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন, যদি আমি রাজি থাকি তাহ'লে···যদি মেয়েটিকে দেখতে চাই তাহ'লে···কিন্তু কথাটা শোনামাত্র আমার সর্বাঙ্গ এমন রী-রী ক'রে উঠলো, এমন বাজে, বিশ্রী, কুৎসিত মনে হ'লো ব্যাপারটা, যে আমি কোনো উত্তর না-দিয়ে উঠে এলাম সেখান থেকে, বৌদি অপ্রস্তুত হলেন। এ কি সম্ভব যে রুক্মি ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে আমি চিন্তা করবো ? এ কি সম্ভব যে তাকে ফিরে পেয়েও আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো আবার ? না—তা সম্ভব নয়, কিছুতেই সম্ভব নয়। তার জোর আমার চাইতে অনেকগুণ বেশি ; আমি যেদিকেই যাই, তাকে ছাড়িয়ে কোথাও যেতে পারি না।—এমনি সেই সময়ে কাটছিলো আমার দিনগুলি, দুই উল্টো টানে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে রুক্মিকে ভুলে যাবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিধ্বস্ত।

একদিন এই যন্ত্রণা আমার অসহ্য হ'য়ে উঠলো, পাটনার টিকিট কিনে ট্রেনে উঠে বসলাম।

৯

স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে উঠে আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গগনবাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম। এটুকু সময়ের মধ্যেই বুঝে নিলাম এখানকার একজন বিশিষ্টতম নাগরিক তিনি, সকলেই তাঁর নাম জানে, ট্যাক্সিওলাকে ঠিকানা বলারও দরকার হ'লো না।

পুরোনো ধরনের গাড়ি-বারান্দাওলা দোতলা বাড়ি, ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়ার জন্য সিংহমুখ নল বসানো—কম্পাউণ্ডে একটি লোক গাড়ি ধুচ্ছে, অন্য দিকে মাটি কোপাচ্ছে মালি। ঢোকার আগে আমি একবার দোতলার জানলাগুলোর দিকে তাকালাম—এর মধ্যে কোন ঘরটা রুক্মির, কোন জানলার ধারে দাঁড়ায় সে? টের পেলাম আমার বুকের মধ্যে হুরহুর করছে।

বেয়ারা আমাকে গগনবরনের আপিশ-ঘরে এনে বসালো, আমার

স্লিপ নিয়ে ফিরে এসে জানালো সাহেবের এখনো গোসল হয়নি, নামতে দেরি হবে। আমি জিগেস করলাম, 'মেমসাহেব আছেন?' 'মেমসাব?' বেয়ারাটি আমার মুখের দিকে তাকালো, জবাব না-দিয়ে চ'লে গেলো— লোকটিকে ভারি অভদ্র মনে হ'লো আমার। অবাক লাগলো, আমি যে সোজা ভেতরে চ'লে যেতে পারছি না, সিঁড়ির মাথায় 'রুক্মি' ব'লে ডেকে উঠছি না, যে-কোনো একজন মক্কেলের মতো এই মস্ত ফাঁকা আপিশ-ঘরটায় একলা ব'সে আছি—যেখানে আমার সামনে কিছু নেই, কাচের আলমারিতে বিরাট মোটা ভীষণ চেহারার আইনের বইগুলো ছাড়া, আর দেয়ালে গান্ধী জওহরলাল বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের ছবি ছাড়া। আর রুক্মি—সে-ই বা কেন চ'লে আসছে না এখানে, আমার নাম-লেখা চিরকুট কি তার চোখে পড়েনি, না কি 'ধীরাজ দত্ত' নামটার এখন আর কোনো মূল্য নেই তার কাছে?

কিন্তু বেয়ারাটিকে কোথাও দেখা গেলো না ; প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গগনবরন ঘরে ঢুকলেন। আগের চেয়েও ভারিক্কি মনে হ'লো তাঁকে, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন বুঝিয়ে দেয়, তিনি জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।

—'এই যে ধীরাজবাবু, নমস্কার। আপনাকে বসিয়ে রাখতে হ'লো ব'লে মাপ চাইছি, সকালবেলাটা খুব ব্যস্ত সময় আমার, এগারোটার মধ্যে কোর্টে বেরোতে হয়···' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি বেশিক্ষণ বসবো না, পাটনায় এসে ভাবলাম একবার খোঁজ নিয়ে যাই আপনাদের, ভালো আছেন তো সবাই?' 'পাটনায় কোনো সাহিত্য-সভা-টভা হচ্ছে নাকি? আমি তো জানতাম না।' 'না, না, ও-সব কিছু নয়, আমি এমনি বেড়াতে এসেছিলাম পাটনায়, আগে আসিনি কখনো।' আমি ভেবেছিলাম গগনবরন জিগেস করবেন আমি

কবে এসেছি, ক-দিন থাকবো ইত্যাদি, এমনকি হয়তো আমাকে তাঁর বাড়িতে অতিথি হ'তেও বলবেন, কিন্তু তাঁকে ঈষৎ অন্যমনস্ক দেখালো, অন্য দিকে তাকিয়ে পাইপ ধরালেন। আমি পুরোনো আলাপ ঝালিয়ে নেবার ধরনে বললাম, 'দার্জিলিঙে আর গিয়েছিলাম নাকি এর মধ্যে?' 'হ্যাঁ, গেলো বছর পুজোর ছুটিতে…' হঠাৎ থেমে, পাইপে টান দিয়ে বললেন, 'কাগজে দেখেছিলেন বোধহয় আমি পাটনার বিধানসভায় রিটার্নড হয়েছি?' 'তা-ই নাকি? বাঃ, খুব ভালো, খুব আনন্দের কথা।' 'শেষ পর্যন্ত জানেন কংগ্রেসেরই নমিনেশন পেয়েছিলাম— মেজরিটি-পার্টি তাই কাজের সুবিধে, কিন্তু বড়ো জগদ্দল হ'য়ে গেছে কংগ্রেস, আমি ভাবছি একটা জিঞ্জার-গ্রুপ করবো…সব ইয়ং ব্লাড… ফ্রেশ আইডিয়াজ়…বিহারের পোটেনশল প্রচুর, কিন্তু পুরোপুরি খাটানো হচ্ছে না এখনো…সবচেয়ে আগে দরকার ল্যাণ্ড রিফর্ম…' মিনিট পাঁচেক ধ'রে এমনি কথা বললেন গগনবরন, তাঁর সুশ্রী ও গম্ভীর মুখে (আগের চেয়েও একটু বেশি গম্ভীর, আমার মনে হ'লো) হাসির রেখা ফুটলো দু-একবার।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। রুক্মির কথা তুলতে আমার দ্বিধা হচ্ছিলো, মাঝে-মাঝে মনে পড়ছিলো যে ইনি রুক্মির স্বামী, রুক্মিকে ইনি, এঁর নিজের ধরনে, ভালোবাসেন। কিন্তু—কিছু কি ঘটেছে এঁদের মধ্যে, উনিও কেন রুক্মিকে ডাকছেন না বা তার কথা কিছুই বলছেন না?

'উঠছেন এখনই?' গগনবরন আমাকে আটকাবার চেষ্টা করলেন না, কিন্তু রাজগিরে বেড়িয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। 'আমার একটা ছোট্ট আস্তানা আছে সেখানে, বলেন তো দরোয়ানকে চিঠি দিতে পারি।' 'যদি যাই নিশ্চয়ই আপনাকে জানাবো।'—একই নিশ্বাসে, যেন কথাটা

জরুরি কিছু নয় শুধু সৌজন্যসূচক, এমনি সুরে বললাম, 'রুক্মি বাড়ি আছে নাকি? তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবো ভাবছিলাম।'

'দেখা করবেন?' কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন গগনবরন। 'আপনি তার খবর কিছু শোনেননি?'

'না তো? কী হয়েছে?' আমার বুকের মধ্যে ধ্বক ক'রে উঠলো, আবার ব'সে পড়লাম চেয়ারটায়।

'সে চ'লে গেছে।'

'চ'লে গেছে? কোথায়?'

'লেফ্‌ট নো অ্যাড্রেস,' বাঁকা ঠোঁটে হাসলেন গগনবরন, পরের কথাটাও ইংরিজিতে বললেন, 'শী হ্যাজ় লেফট মি—বুঝেছেন?' তাঁর গলাটা হঠাৎ একবার ভেঙে গেলো।

আমি মিনিটখানেক কথা বলতে পারলাম না। গগনবরনের মুহুরি এসে কয়েকটা নথি রাখলো তাঁর সামনে। গগনবাবুর মুখের ভাব নিমেষে বদলে গেলো, ক্ষিপ্র আঙুলে উল্টে গেলেন সেগুলো। 'পার্টিশন-স্যুটের ছ-নম্বর দলিল টাইপ হ'য়ে গেছে?' 'করেছি, স্যর। আর এক ঘণ্টার মধ্যে সবগুলো হ'য়ে যাবে।' 'একবার এভিডেন্স অ্যাক্টটা দিয়ে যেয়ো তো।' বিরাট বইটি টেবিলে রেখে মুহুরি পাশের ঘরে চ'লে গেলো। গগনবরন ক্ষিপ্র হাতে পাতা উল্টে বইটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। আমি বুঝলাম এটা আমার প্রতি বিদায়ের ইঙ্গিত, রুক্মির প্রসঙ্গ এড়াতে চাচ্ছেন গগনবরন—তবু জিগেস না-ক'রে পারলাম না, 'কবে হ'লো এটা? কবে চ'লে গেলো রুক্মি?'

গগনবরন এভিডেন্স অ্যাক্ট থেকে চোখ তুললেন। 'এই তো মাস ছয়েক আগে। আমি তখন ইলেকশন নিয়ে দুর্দান্ত খাটছি, গ্রামে-গ্রামে ঘুরতে হচ্ছে ক্যাম্পেনে, নাকে-মুখে পথ দেখছি না—এরই মধ্যে হঠাৎ

একদিন উধাও। আমার অবস্থাটা ভাবুন। অ্যাণ্ড হার পুওর ওল্ড প্যারেণ্টস! রাদার এ শ্যাবি ডীল, ডোণ্ট ইউ থিঙ্ক সো? আর বাইরে থেকে দেখতে এত ভালো, শান্তশিষ্ট—নো ডোমেষ্টিক কোঅর্লস, নাথিং অব দি সর্ট, বজ্রপাতেব মতো ব্যাপার। তা শুনছি ওর মা-বাবা আবার অ্যাকসেপ্ট করেছেন ওকে, লণ্ডনে না হাইডেলবার্গে না কোথায় যেন পড়াশুনো করছেন ওঁদের বিদুষী কন্যা···তা ভালো, নান্ অব মাই বিজ্নেস, আই'ভ ওঅশ্‌ড মাই হ্যাণ্ডস অব ইট অল···' গগনবরন আইনের বইয়ে চোখ নামালেন আবার, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনটা দ্বিগুণ ভারি হ'য়ে গেলো। আমার ইচ্ছে হ'লো তাঁকে বলি—সব খুলে বলি—বলি যে রুক্‌মি নিরপরাধ, সব দোষ আমার—আমার—এই ঘটনার জন্য আমি ছাড়া কেউ দায়ী নয়। এতদিনে আমার মনে হ'লো আমি ভীষণ একটা অন্যায় করেছিলাম।

আমার মুখ দিয়ে বেরোলো, 'আপনি তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেননি?'

'আপনি কি ভাবছেন সে ফিরে আসার জন্য চ'লে গিয়েছিলো?' গগনবরন শুকনো গলায় হাসলেন। 'না কি ভাবছেন সে ফিরে এলেও এ-বাড়ির দরজা আর খোলা পাবে? আমাদের একটা পারিবারিক সম্মান আছে, ধীরাজবাবু, আমরা এখানে তিন পুরুষ ধ'রে ডোমিসাইল্ড, ঠাকুর্দার নামে একটা রাস্তাও আছে গঙ্গার ধারে। আর আমার কেরিয়ারের পক্ষেও খারাপ হ'লো এটা, ভোটাররা এ-সব পছন্দ করে না বোঝেন তো।'

'সে তো ঠিক কথা, সে তো ঠিক কথা—' বলতে-বলতে আমি উঠে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে, বিদায় নেবার মুখে হঠাৎ জিগেস করলাম, 'আপনার বাড়ি থেকে কি গঙ্গা দেখা যায়?

'একেবারে গঙ্গার ধারেই এই বাড়ি করেছিলেন ঠাকুর্দা, কিন্তু আমি তা দেখিনি—নদী স'রে গেছে অনেকটা, চড়া পড়েছে, তবে এখনো ছাতে উঠলে দেখা যায়।···তা জানেন, পাব্লিক মেমরি ইজ় শর্ট, এরই মধ্যে ভুলে যাচ্ছে লোকেরা, সেদিক থেকে দুশ্চিন্তার খুব কারণ আছে ব'লে মনে হচ্ছে না আমার। আচ্ছা তাহ'লে···'

বেরিয়ে এসে দোতলার জানলাগুলোর দিকে আর-একবার তাকালাম আমি, ঘাড় উঁচু ক'রে ছাদটাকে নজর করলাম। কার্নিশে ঘেরা প্রকাণ্ড ছাদ—অনেক দূরে, অনেক উঁচুতে, মনে হয় নিচের তলার কোনো কলরোল সেখানে পৌঁছয় না। নিশ্চয়ই রুক্মির প্রিয় ছিলো জায়গাটা, সে মাঝে-মাঝে বেড়াতো ওখানে, বিকেলবেলা বই পড়তো ব'সে-ব'সে, কখনো বই থেকে চোখ তুলে তাকিতে থাকতো চুপ ক'রে। একদিন গগনবরন যখন ইলেকশন নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, যখন সন্ধেবেলার আকাশটাকে মনে হচ্ছে খুব বিরাট আর নিঃসঙ্গ, যখন দিনের আলো মুছে গেছে অথচ কোনো তারাও বেরিয়ে আসেনি, ঘুমিয়ে পড়ার আগে মৃদু শব্দে ডানা ঝাপটাচ্ছে পাখিরা—রুক্মি, তুমি কি তখন ঝাপসা-হ'য়ে-আসা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হঠাৎ মনস্থির করেছিলে? হঠাৎ কি তোমার অসহ্য মনে হয়েছিলো—গগনবরনের সঙ্গে তোমার এই জীবন? কিন্তু কেন, রুক্মি, কেন? আমার কি কোনো হাত ছিলো এই ঘটনায়? আমি কি তোমাকে এই রাস্তায় এগিয়ে দিয়েছিলাম?

ট্রেনে সারারাত আমার ঘুম হ'লো না, পরের দিন সকালে হাওড়া স্টেশনে নেমেই আমার মনে পড়লো অবন্তী ঘোষকে। রুক্মি এখন ঠিক কোথায় আছে তা কলকাতায় কেউ যদি জানে তো সে-ই জানবে। কিন্তু য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে শুনলাম ডক্টর ঘোষ হল্যাণ্ডে চ'লে গেছেন। মনে হ'লো জীবনে আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আমার পুরোনো

জীবনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব মনে হ'লো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হ'তে-হ'তে আমি যেন হঠাৎ একদিন নিজেকে চিনতে পারলাম। টাইগার হিল-এ তারা-ভরা আকাশের তলায় যে-জীবন আমাকে মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গিয়েছিলা, তা আমি পাবো না কোনোদিন—কিন্তু অন্য এক জীবন আছে যা লক্ষ-লক্ষ মানুষের, অন্য এক জীবন আছে যাতে আনন্দ নেই, যন্ত্রণাও নেই, অন্য এক জীবন আছে যা নিয়ে বেঁচে থাকা যায়। একমাসের মধ্যে উষা কেমিকেল ওঅর্কস-এ পি. আর. ও-র চাকরি জুটিয়ে ফেললাম, তাব কুড়ি দিনের মধ্যে কমলার সঙ্গে আমার বিয়ে।

উপসংহার

অবশেষে আমার ছুটির তিন সপ্তাহ ফুরোলো, আজ উইণ্ডামিয়ার হোটেলে আমাদের শেষ রাত্রি। এখন সাড়ে-দশটা রাত, কমলা শোবার আগে খুচরো জিনিশগুলো গুছিয়ে রাখছে। লটবহর বেড়ে গেছে এবার, টবলুর জন্য তিব্বতি বোখো থেকে শুরু ক'রে আমার জন্য পশমি স্যুটের কাপড় পর্যন্ত অনেক-কিছু কিনে ফেলেছে কমলা, নিজের জন্য নেপালি কানপাশা ('অপূর্ব ডিজ়াইন—তা-ই না ?') তাছাড়া অবশ্য কলকাতার আত্মীয়-বন্ধু প্রায় সকলের জন্যই ছোটোখাটো উপহার, তার মামাতো বোনের ছ-মাসের বাচ্চাটিকেও ভোলেনি—আশ্চর্য মেয়ে সত্যি কমলা। আমাকে সওদাপত্র দেখিয়ে ভাগ ক'রে-ক'রে-তুলে রাখলো সব—কোনোটা স্যুটকেসে, কোনোটা তার বিবিধ হাতব্যাগের কোনো-একটায়, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, একটা কথা—তুমি কি এখানে এসে একটা লেখা আরম্ভ করেছিলে ?' 'লেখা ? না তো।'

'তবে যে দেখলাম একটা খাতায় কী লিখেছো ?' 'আজই দেখলে বুঝি ? কিন্তু সব কেটে দিয়েছি দেখলে না ?' 'কেন কেটেছো তা-ই তো জিগেস করছি আমি। এখানে বারো লাইন, ওখানে কুড়ি লাইন, কিন্তু সবই বোকাট্টা—এ আবার কী-রকম নমুনা।' 'পারি না, তাই।' 'পারো না মানে ?' শুতে যাবার প্রস্তুতি হিশেবে হাতের মোটা কাঁকনটা খুলে ফেললো কমলা, আমার মুখের ওপর চোখ ঝলসে বললো, 'ঐ আরম্ভটুকু এত ভালো লাগছিলো আমার—পাহাড়ের ওপর একটা পোড়ো বাড়ি, কেমন একটা গা-ছমছম-করা ভাব—আমি ভাবছি কিছু-একটা ঘটবে এখনই—হুশ, আর তো নেই। এ ভারি অন্যায় কিন্তু তোমার!' আমার দিকে পেছন ফিরে ব্লাউজ় আর ব্রা ছাড়লো সে, শুধু আঁচলে গা ঢেকে, মাত্র এক ফালি পিঠ আর কয়েক ইঞ্চি কাঁধ দেখিয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্যে ঢিলেঢোলা একটা ব্লাউজ় প'রে নিলো। 'বলো না, ঘটনাস্থল দার্জিলিং নাকি, আর চিঠির ফর্মে শুরু করেছো কেন ?'—ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখের একটা ভঙ্গি করলো সে—'আমার কেমন সন্দেহ-জনক মনে হচ্ছে।' মুখে স্বামীশোভন হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'আমার অনেক ভাগ্য তুমি আমাকে সন্দেহের যোগ্য ব'লে ভাবো।' 'থাক থাক আর ভালোমানুষি দেখাতে হবে না,' কমলা আঙুলের ডগায় কোল্ড ক্রীম তুলে নিলো, 'সেই কলেজে পড়ার সময় যা-সব কথা শুনতাম তোমাকে নিয়ে কফি-হাউসে!' 'আমিও শুনতাম।' 'সত্যি জানো, আমার কেমন ভয়-ভয় ছিলো তোমার বিষয়ে, কিন্তু বিয়ের পরে দেখি—' কোল্ড-ক্রীম-মাখা চকচকে ঠোঁটে হাসলো কমলা—'ও মা, দিব্যি একটি ভদ্রলোক তো!' 'একবার বিয়ে ক'রে ফেললে আর ভদ্রলোক না-হ'য়ে উপায় কী।' এই রসিকতাটা পুরোনো এবং পচা, কিন্তু এবারেও সে খুশি হয়েছে বুঝলাম, আমি যে তারই জন্য কী-বলে-

গিয়ে 'নতুন মানুষ' হয়েছি সে-বিষয়ে তার একটুও সন্দেহ নেই। তবু, যা নিয়ে তার মনে একটু দুঃখ সেটাও তার পরের কথাতেই বেরিয়ে পড়লো। 'কিন্তু বিয়ের পরেই তোমার লেখা কেন বন্ধ হ'লো? বলো সত্যি ক'রে!'

এটাও খুব পুরোনো প্রশ্ন, উত্তরগুলিও পুরোনো—তবু মাঝে-মাঝে ঝালাই ক'রে নেয় কমলা—যখনই কোনো বিয়ে-বাড়িতে গিয়ে দ্যাখে নীলাক্ষ সেনের 'মোহিনী মায়া' দশ কপি পড়েছে আর আমার কোনো পাত্তা নেই, বা যখন রেডিওর কোনো বক্তা আধুনিক বাংলা উপন্যাস নিয়ে বলতে গিয়ে আমার নাম করতে ভুলে যান। 'বিয়ের পরে তো নয়, আগে থেকেই।' আমি সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিলাম ইজি-চেয়ারে, কমলা পা ঝুলিয়ে হাতলটার ওপর ব'সে বললো, 'তা বাপু লোকেরা তো বলতে ছাড়েনি—"বিয়ে ক'রে কেমন চুপসে গেলো ধীরাজ দত্ত! আর আওয়াজ নেই!" বিশ্রী লাগতো আমার, কষ্ট হ'তো—এখনো হয়।' 'কষ্ট কেন—তোমার কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে?' 'আ-হা—সুবিধে-অসুবিধেটাই সব কথা নাকি? শোনো,' আমার মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বললো, 'এই লেখাটা তুমি শেষ কোরো প্লীজ়, আমাকে কথা দাও করবে—অ্যাদ্দিন বাদে তোমার নতুন লেখা বেরোলে হৈহৈ প'ড়ে যাবে দেখো।' 'তা-ই নাকি?' একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'তোমার চেহারা খুব ভালো হয়েছে, কমলা।' 'আসলে আমার ওজন ক'মে গেছে জানো,' ঝকঝকে দাঁতে হাসলো সে, 'এখানে তো সারাক্ষণই হাঁটা-চলা, ফিগার ঠিক রাখার পক্ষে দার্জিলিঙের মতো জায়গা নেই।' কমলা চেয়ারের হাতলে গা এলিয়ে দিলো, আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ঐ খাতাটা দেখি একবার—হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো, মন্দ হয়নি নেহাৎ, লিখে ফেললে হয়।...তুমি শুয়ে পড়ো, আমি একটু বসি এটা

নিয়ে, কেমন?' 'এক্ষুনি বসবে? কাল আবার সকাল-সকাল উঠতে হবে মনে রেখো।' 'দেখি—যদি হ'য়ে যায় খানিকটা—তোমার কথা শুনে উৎসাহ পাচ্ছি।' বড়ো আলো নিবিয়ে আমি টেবল-ল্যাম্প জ্বাললাম, কয়েক মিনিট পরেই কমলার নিশ্বাসের শব্দ ভারি হ'লো।

সেদিন আমাকে কোন ভূতে পেয়েছিলো জানি না, কয়েকটা লাইন লিখে ফেলেছিলাম, বাড়িটা বড্ড নাড়া দিয়েছিলো আমাকে। তারপব এতদিনের মধ্যে আর ফিরে যাইনি—শুধু আরম্ভ-করা চিঠিটা লিখে যাচ্ছিলাম—মনে-মনে, অবিশ্রান্ত—লিখছি আর ছিঁড়ে ফেলছি, শীত-নামানো উত্তুরে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে টুকরোগুলো, কোথায় শেষ হবে আমার চিঠি তা ভেবে পাইনি, কিন্তু আজ জানি কোথায় শেষ, আমি দেখে এসেছি। আমি গিয়েছিলাম আজ আরো একবার, এই শেষ দিনে চন্দ্রকোণাব কাছে বিদায় নিতে, আমি বিদায় নিয়ে এসেছি—আর এখন, এই ঠাণ্ডা নিথর নিঃশব্দ রাত্রে আমি টের পাচ্ছি আমার মনের মধ্যে এক নতুন সুখ—যেন এক ফোঁটা উষ্ণতা—রুক্মির শেষ উপহার, আমাকে।

আজ অন্য রকম দেখলাম চন্দ্রকোণাকে। সামনের ফটকে তালা নেই, কোনো-কোনো জানলায় কাচের ওপর থেকে পর্দা স'রে গেছে, বাগানে ঝাঁট পড়েছে মনে হয়, আগাছা তত ঘন নেই আর, অবশিষ্ট রোগা ডেলিয়া ক-টাও একটু যেন প্রফুল্ল। কেউ এলো নাকি? ঢুকতে আমার পা সরলো না, কিন্তু চ'লে আসতেও পারলাম না তক্ষুনি—অগাধ ছিলো বিকেলের রোদ, পাইন-বনে পুরোনো দিনের শব্দ হচ্ছিলো, আমি সামনের সরু রাস্তাটুকুতে পাইচারি করতে লাগলাম—আলো থেকে বেগনি রঙের ছায়ায়, ছায়া থেকে হলুদ-রঙা রোদ্দুরে, ভাবছি ঐ বাড়িটার মধ্যে এখনো সেই বইগুলো আছে কিনা যা রুক্মি আমাকে

পড়াতে চেয়েছিলো, সেই সব পুতুল এখনো আছে কিনা যা রুক্মি খুব নরম হাতে তুলে-তুলে দেখিয়েছিলো আমাকে, দূর দেশে মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে কেমন লেগেছিলো রুক্মির, ভাবছি হরেন ডাক্তারের 'সপাতাল কি উঠে গেলো—এদিকে সূর্য চ'লে পড়ছে পাহাড়ের ছনে, রোদের রং আবিরের মতো এখন, সামনের পাইন গাছ দুটো লম্বা য়া ফেলেছে বাগানে—আমি আর-একবার তাকালাম বাড়িটার দিকে, র্তের জন্য আমার হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গেলো।

ওরা বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। পুরুষটি একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছে, তার চেয়ে লম্বা একটি মহিলার পাশে—ঠিক পাশে নয়, দু-জনের খানে একটি বছর সাতেকের বালক, সুন্দর, অতি সুন্দর একটি ন—আমার মনে হ'লো অত লাবণ্য অত মাধুর্য অন্য কোনো শিশুর আমি দেখিনি।

- ামি একটা গাছের পেছনে স'রে গেলাম, ওরা তিনজন এগিয়ে আমার দিকে, বালকটির জন্য আস্তে হাঁটছিলো ওরা, আমি ক্ষণ ধ'রে দেখতে পেলাম—পুরুষটির ঠোঁটের কোণে সেই লাজুক ন যা আগে আমি দেখেছিলাম একবার, তার কপাল আরো স্বচ্ছ মনে লা, তার চোখ আরো উজ্জ্বল, আর মহিলাটি, মেয়েটি—তাকে দেখতে য় আমার চোখ ঝাপসা হ'য়ে গেলো।

ওরা গুনগুন ক'রে কী বলছিলো আমি শুনতে পাইনি—শুধু, ঠিক ন আমার পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে তখন আমার কানে এলো নিচু নরম কা একটু হাসির শব্দ—অনেক দূর থেকে যেন, অনেক খানা-খন্দে । উঁচু-নিচু বছর পেরিয়ে। আমাকে ছাড়িয়ে চ'লে গেলো ওরা, নিচে ছে, ঐ বাঁকটার পরেই আর দেখা যাবে না ওদের—আমাকে সারা

শরীরে কাঁপিয়ে দিয়ে নিঃশব্দ একটা কথা বেরিয়ে এলো সেই মুহূর্তে—'রুক্মি, অবন্তী, আর তোমাদের সুন্দর সন্তান—আমি তোমাদে: ভালোবাসি, ভালোবেসেছি, জীবনে হয়তো এই প্রথম আমি ভালো-বাসলাম !'

সন্ধে নামলো, ঝাপসা হ'য়ে গেলো চন্দ্রকোনা, গাছের ফাঁকে-ফাকে বাতাস ব'লে বেড়াতে লাগলো, 'আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবেসেছি।' এই একটি কথা নিয়ে, রুক্মি, আমি ফিরে যাচ্ছি কাল—একমা যে-জীবনের আমি যোগ্য সেই জীবনে—কিন্তু এই কথা যেন থাক আমার সঙ্গে বাকি জীবন, যেন মনে পড়ে—মাঝে-মাঝে—কোনো বর্ষা দুপুরে, কোনো শীত-প'ড়ে-আসা সন্ধ্যায়, আজকের এই মুহূর্তটি আমার বুকের মধ্যে অদ্ভুত এই একফোঁটা সুখ, তোমার নরম হাতের স্পর্শ রুক্মি, প্রায় শান্তির মতো।